# চারশ' বছরের

# পাশ্চাত্য দর্শন

অধ্যাপক—উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য




সংস্কৃতি বৈঠক

বালিগঞ্জ : কলিকাতা

—প্রকাশক—

সংস্কৃতি বৈঠকের পক্ষে

শ্রীশিশিরকুমার আচার্যচৌধুরী

১৭, পণ্ডিতিয়া প্লেস, বালিগঞ্জ, কলিকাতা

প্রচ্ছদপট ঃ

শ্রীহৃষীকেশ সেনগুপ্ত

প্রচ্ছদপট—ব্লক ও মুদ্রণ ঃ

ইণ্ডিয়ান প্রেস লিঃ

৯৩-এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট্

পুস্তক মুদ্রণ ঃ

শ্রীহরিপদ পাত্র

সত্যনারায়ণ প্রেস

১৬০, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

---



মূল্য ঃ আড়াই টাকা

# চার শ’ বছরের পাশ্চাত্ত্য দর্শন

বাংলা ভাষায় গুরু-গম্ভীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই বাহির হয় না, এই একটা অভিযোগ আমরা অনেক কাল শুনিয়াছি। ইদানীং আর ইহা সম্পূর্ণ সত্য নয়। এই সব বিষয়ে বাংলায় এখন বই বাহির হইতেছে। অবশ্যই, ইউরোপের ভাষা-সকলের তুলনায় বাংলার সম্পদ্ অনেক কম, তাহা অস্বীকার করিতে না পারিলেও, ভারতের অন্যান্য ভাষার তুলনায় বাংলার সমৃদ্ধি যে বেশী, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। তথাপি আমাদের করণীয় আছে। চারিদিকের বিশ্বের বিবিধ জ্ঞানের আস্বাদ এক মাতৃভাষার সাহায্যেই বাঙ্গালী কেন পাইবে না? আজ রাষ্ট্র-বোধ ও জাতি-বোধের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নটাও আমাদের মনে উঠিয়াছে।

রাষ্ট্র-নীতি, অর্থ-নীতি প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ ও গ্রন্থ বাংলায় এখন অনেক বাহির হইতেছে। কিন্তু এই দর্শনের দেশে—এই নব্য-ন্যায়ের বিকাশ-ভূমিতে—দর্শনের বই আরও বাহির হইবে না কেন? শুধু দেশের প্রাচীন জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি না করিয়া বিদেশের জ্ঞানও আমাদের আমদানী করা উচিত। আমাদের পূর্বপুরুষদের জ্ঞানের ভাণ্ডার মোটেই নগণ্য নয়, তাহা জানি। কিন্তু তথাপি এই ভাণ্ডারে প্রতীচ্য জ্ঞান-বারিধি হইতে আহৃত রত্নেরও স্থান রহিয়াছে। জ্ঞানের ভাণ্ডার সম্পূর্ণ মনে করিয়া কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই উহার দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখে না; নিত্য নূতন জ্ঞানের আগমনের পথ উন্মুক্ত রাখাই প্রকৃত জ্ঞান-পিপাসু ও সমাজ-হিতৈষীর কর্তব্য। বাহিরের জ্ঞান বাংলা ভাষায় আরও প্রচারিত হওয়া উচিত, ইহা বিশ্বাস করি বলিয়াই আমাদের এই উদ্যম।

এই বইয়ে কি আছে, তাহা বইয়ের নামেতেই প্রকাশ পাইতেছে। উহা ভাল ভাবে বলা হইয়াছে, কি মন্দ ভাবে, তাহা জানিতে হইলে পাঠককে একটু পরিশ্রম করিয়া কি টা পড়িতেই হইবে অন্তত আদিম ও অন্ত্য অধ্যায়। যে পরিশ্রমটুকু এই বই পড়িবার জন্য পাঠক-পাঠিকারা করিবেন, তাহার জন্য তাঁহাদিগকে যদি পরে পরিতাপ করিতে না হয়, তাহা হইলেই আমাদের চেষ্টা সফল হইয়াছে মনে করিব।

আরও একটা কথা এখানে বলা দরকার যাহা গ্রন্থের কোথাও প্রকাশ পায় নাই, সেটি প্রকাশকের যত্ন। সুশৃঙ্খল সমাজের শান্ত জীবন যখন দেশে নানা ভাবেই ব্যাহত, সভ্যতার সেই সাময়িক আকস্মিক বিলোপের মধ্যেও যে এই বইখানা সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হইল, তাহার জন্য 'সংস্কৃতি বৈঠক' প্রশংসার যোগ্য।

সমাজের অশান্ত অবস্থার মধ্যে ছাপার কাজ শেষ হইয়াছে বলিয়া যেসব ভুল-ভ্রান্তি রহিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য লেখক ও প্রকাশক পূর্ব হইতেই পাঠক-পাঠিকাদের নিকট মার্জনা চাহিতেছেন। এই সব ভুল 'ভ্রম সংশোধনে' যথাসম্ভব শুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ গ্রন্থকার

# বিষয় সূচী

---

# চার শ' বছরের পাশ্চাত্ত্য দর্শন

## ১। উপক্রম

জগতের জড়পদার্থের তিনটি অবস্থা ও প্রভেদ আমরা জানি :— কঠিন, তরল ও বাষ্প। বাষ্পকে জমাইয়া তরল করা যায়—যেমন বায়ুও তরল হইতে পারে; তখন উহা জায়গা কম লইবে। আবার তরলকেও কঠিন করা যায়—যেমন জল বরফ হয়; জল বরফ হইলে জায়গা কম লয় না, বেশী লয়। কিন্তু অন্য তরল পদার্থ জমিয়া কঠিন হইলে কম জায়গায়ই থাকিতে পারে—যেমন ঘী। তুলাকে চাপিয়া বস্তাবন্দী করিলেও জায়গা কম লয়। এইভাবে কম জায়গায় ধরাইবার জন্য জড়-পদার্থকে আমরা চাপিয়া কমাইয়া লই। অ-জড়কেও—যেমন জ্ঞান বা বিদ্যাকেও—সংক্ষিপ্ত করিতে হয় নানা প্রয়োজনে। যে 'সিদ্ধান্ত-কৌমুদী", পড়িতে পারিবে না—হয়ত বা শক্তি নাই অথবা সময় নাই—তাহাকে 'লঘু-কৌমুদী' পড়াইতে হয়; যাহার বেদান্ত পড়িবার সময় নাই, তাহাকে বেদান্ত-সার পড়িয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়; যে সকল দর্শনই জানিতে চায়, অথচ সব পড়িবার সময় যাহার নাই, তাহাকে 'সর্বদর্শন-সংগ্রহে' সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।

বিদ্যার চর্চায় সংক্ষেপ এবং বিস্তৃতি দুই-ই মানুষকে করিতে হয়; কিন্তু দুই-য়েতেই পরিশ্রম আছে—ত্রুটি-বিচ্যুতির আশঙ্কাও আছে। চার শ' বছরের পাশ্চাত্ত্য দর্শনকে এক শ' পৃষ্ঠায় সংক্ষিপ্ত করিতে যাওয়ার বিপদ

এই যে, তাহাতে অনেক প্রয়োজনীয় কথাই হয়ত বাদ পড়িয়া যাইবে— চিত্রের অনেক মনোরম অংশেই হয়ত আলো পড়িবে না। সংক্ষিপ্ত পরিচয় অভিলাষ করিলে ইহার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। তাজমহলে দুই মিনিটের বেশী সময় দিতে না পারিলে তাহার অনেক কারুকার্যই চোখে পড়িবে না। কিন্তু সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও পরিচয়; সে পরিচয়ে যাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইবে, সে স্বভাবতই ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের জন্য উদ্যম করিবে। পাশ্চাত্য দর্শনের বেলায় সে উদ্যমে কেহ যদি আমাদের দ্বারা উৎসাহিত হন, তবে আমাদের পক্ষে সেইটিই যথেষ্ট পুরস্কার হইবে।

## ২। দর্শনে প্রাচী ও প্রতীচী

সত্যকে সমগ্রভাবে দেখিবার চেষ্টাকেই আমরা সাধারণত দর্শন কহিয়া থাকি। সত্যের সন্ধান বা তত্ত্ব-দৃষ্টি হিসাবে দেশ-বিশেষে বা যুগ-বিশেষে ইহার রূপের কোন পরিবর্তন হওয়া উচিত নয়, ইহাই স্বভাবত মনে হইতে পারে। জ্যামিতি মিশরে আর ভারতে দুই রকম নয়; দুইয়ে-দুইয়ে যোগ করিলে পৃথিবীর সর্বত্রই চার হয়; পৃথিবীর বাহিরের সংবাদ জানি না, তবে সেখানেও দুইয়ে দুইয়ে চার হয় না, ইহা ভাবিতে পারি না। তেমনই পদার্থবিদ্যা বা রসায়নের তত্ত্ব সর্বজাগতিক সত্য; সময় বা দেশ অনুসারে পৃথক্ নয়। দর্শনও তেমনই সর্বকালে ও সর্বদেশে এক হওয়া উচিত। সাধারণভাবে কথাটা অসত্য না হইলেও পরিপূর্ণ সত্য নয়। তাহার কারণ বলিবার আগে সমশ্রেণীর আর একটি উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে।

কবি প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা করেন কিংবা মানুষের গূঢ়-অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং স্নেহ, মমতা, প্রেম প্রভৃতি মনোভাব ত সবদেশেই কম বেশী একপ্রকার। নীল আকাশ, আকাশের

নক্ষত্রমালা, মৃদু-সমীর, কোকিলের ডাক, ফুলের রূপ, সূর্যের রাঙা আলো ইত্যাদি ত সব দেশেই প্রায় একই রকম সুন্দর। আর নারীর সৌন্দর্য সব দেশের ধারণায় একই রকম না হইলেও নারীর প্রতি পুরুষের প্রেম ত ভিন্ন রকমের নয়! সুতরাং কাব্যের যাহা বিষয় তাহা ত একই রকম। কিন্তু সব দেশের কাব্যই কি এক? ভিন্ন দেশের কিংবা একই দেশের ভিন্ন যুগের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত সকলেই জানেন যে, উহা এক নয়। 'ওমর খৈয়ম' ও ভবভূতির কাব্য এক নয়; আর ভারতচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রভেদও প্রচুর। কেন? কারণ, সকলের—সকল দেশের সকল সময়ের—সৌন্দর্য অনুভূতি এক নয়। পাখীর মধ্যে কাব্যে সকলের চেয়ে বেশী স্থান অধিকার করিয়াছে চাতক ও কোকিল। কিন্তু এই চাতক ও কোকিল শেলী; ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ এবং ভারতের কবিদের মনে একই রকম অনুভূতি জাগ্রত করে নাই। জড়জগতে চন্দ্র কবিদের দৃষ্টি খুব আকর্ষণ করিয়াছে; কিন্তু সব দেশে এক রকমে নয়। সেইজন্য কাব্যে সাম্য যেমন আছে, বৈষম্যও তেমনই আছে।

একই সৌন্দর্যের অনুভূতির প্রকারভেদে কাব্য পৃথক্ হয়। বিজ্ঞানে সত্য এক, ব্যক্তিগত অনুভূতির কোন স্থান সেখানে নাই; সুতরাং বিজ্ঞান সর্বত্রই এক—অপৃথক্। দর্শনে বিজ্ঞানের সত্যদৃষ্টির সঙ্গে ব্যক্তির অনুভূতি মিশিয়া যায়; উহা অনুভূতি ও জ্ঞানের সমন্বয়ের চেষ্টা;—উহা কাব্য ও বিজ্ঞান উভয় হইতেই বৃহত্তর; কিন্তু উহাতে উভয়ের বৈশিষ্ট্যও বর্তমান রহিয়াছে; এবং সেইজন্যই উহা একই তত্ত্বের চিন্তা করিলেও অনুভূতির প্রকার ভেদ অনুসারে দেশভেদে ও কালভেদে ভিন্নরূপ ধারণ করিয়া থাকে। প্রাচী ও প্রতীচীতে দর্শনের এই রূপভেদ একটু অনুধাবন করিলেই ধরা যায়।

পূর্বে এবং পশ্চিমে উভয়ত্রই দর্শনের ইতিহাস দীর্ঘ। পূর্বে দর্শনের

কতকগুলি যুগভেদ আছে, সেকথা আমরা পরে বলিতেছি। পশ্চিমে দর্শন আরম্ভ হয় গ্রীসে। গ্রীস্ এশিয়ার পশ্চিমে অবস্থিত। এশিয়ার সঙ্গে তাহার যোগাযোগ ছিল—ভারতের সঙ্গেও ছিল। গ্রীসে যে দর্শন আরম্ভ হয়, তাহাতে কোন ভারতীয় প্রভাব আছে কিনা, প্রশ্ন হইতে পারে। কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক কখনও হইয়া থাকিলেও পশ্চিম ইউরোপ অর্থাৎ ইটালী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও জার্মনী গ্রীক দর্শনকে ক্রমশ আপন করিয়া লয়; এবং ইহার পরবর্তী গতি-বৃদ্ধি ইউরোপীয় দর্শনেরই অন্তর্গত। তাহা না হইলেও গ্রীসের দর্শনের গতি গোড়া হইতেই ভারতীয় দর্শন হইতে একটু পৃথক্ ধরণের ছিল। মোটামুটি আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনেও সেই ধারা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। দর্শনের আলোচ্য বিষয়, আলোচনার ভঙ্গি ইত্যাদি অনেক বিষয়েই সকল দর্শনের মধ্যেই একটা সাম্য আছে। কিন্তু ইউরোপের দর্শন মোক্ষশাস্ত্র নয়, সেখানে জ্ঞান শুধু পারলৌকিক প্রয়োজন-সিদ্ধির উপায় মাত্র নয়। কখনও কখনও প্রয়োজনের কথাও উঠিয়াছে; কিন্তু সে প্রয়োজন ঐহিক জীবনের প্রয়োজন—মুক্তি নয়। জ্ঞান শক্তি—( Knowledge is power ),—বাহ্য প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তারের সহায়ক—একথা ইউরোপের আধুনিক যুগে বেকন প্রভৃতি দার্শনিকেরা খুব জোর গলায় বলিয়াছেন। আর, গ্রীসে সোক্রেতিসের সময়ে জ্ঞানই পুণ্য ( Virtue is knowledge ), ইহাও বলা হইয়াছে। কিন্তু মোক্ষশাস্ত্র বলিতে ভারতে যাহা বুঝি, সে জিনিস ইউরোপের দর্শন নয়। মোক্ষের কথা কি সেখানে উঠে নাই? স্বর্গের কথা? পুণ্যের পুরস্কারের কথা? আত্মার পরিত্রাণের কথা? তাহার অনন্ত জীবনের কথা? অমরত্বের কথা? উঠিয়াছে বই কি! বিশেষতঃ মধ্যযুগের ইউরোপে লোকে এসবের কথা খুব শুনিয়াছে এবং ভাবিয়াছে। কিন্তু তাহা গীর্জার অন্তরালে—ধর্মের পুষ্পপুটের ভিতর; প্রকৃত দর্শনে ততটা

নয়। নবীন দর্শনে সেই জিনিস নাই বলিলেও চলে। সুতরাং সাধারণভাবে যদি আমরা এই সিদ্ধান্ত করি যে, ইউরোপীয় দর্শন ভারতের দর্শনের মত মোক্ষশাস্ত্র নয়, তাহা হইলে কেহ দোষ ধরিতে পারিবেন না।

ইহা নিন্দাও নয়, প্রশংসাও নয়; শুধু স্বরূপ-কথন। ইহা জানা দরকার এইজন্য যে, কেহ যদি মোক্ষমার্গের সন্ধানে বেকন কিংবা বার্গসেঁা পড়িতে চান অথবা যোগে পটু হইবার জন্য কাণ্ট অথবা স্পেন্সর্ অনুসরণ করেন, তবে তাঁহার নিরাশার অন্ত থাকিবে না। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে জ্ঞান আছে, তত্ত্বকথা আছে, যেমন গণিতে বা পদার্থবিদ্যায় আছে, তেমনই; আত্মা-অনাত্মার সূক্ষ্ম বিচার আছে, বিশ্বব্যাখ্যা আছে, ধর্ম-অধর্মের কথাও আছে, কিন্তু বন্ধ-মোক্ষের কথা বড় কম; উহা প্রায় সর্বত্রই অপ্রধান।

## ৩। যুগ বিভাগ

কতকগুলি বৈশিষ্ট্য অনুসারে পাশ্চাত্ত্য দর্শনে কয়েকটী পৃথক্ যুগ কল্পিত হইয়া থাকে। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক এই তিনটী যুগ সহজেই বুঝা যায়। প্রাচীন যুগে গ্রীসের চিন্তার পূর্ণ প্রাধান্য দেখা যায়; মধ্যযুগে খ্রীষ্টান ধর্ম সমস্ত ইউরোপের জীবন ও চিন্তা গ্রাস করিয়া রহিয়াছে; তখন দর্শন যাহা হইয়াছে তাহার স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা কম; ধর্ম-প্রযোজকদের অনুকম্পার উপর দর্শনকে তখন নির্ভর করিতে হইত। আধুনিক যুগে ধর্মের বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বাধীন গতিতে দর্শন অগ্রসর হইতে থাকে। সে যুগ এখনও চলিতেছে। শতাব্দীর বিভাগে ক্ষুদ্র অঙ্ক বাদ দিলে প্রাচীন যুগ খ্রী: পূ: ৬০০ হইতে খ্রীষ্টীয় ৫০০ অব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত; খ্রী: ৫০০ হইতে ১৫০০ পর্যন্ত মধ্যযুগ; আর খ্রী: ১৬ শতাব্দী হইতে আজ পর্যন্ত নবীন যুগ চলিতেছে।

এই কয়টী যুগ সাধারণভাবে সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কেহ কেহ আবার ইহাদিগকে আরও একটু সূক্ষ্মভাবে বিভক্ত করিয়া থাকেন *। যথা—(১) প্রকৃত গ্রীক্ যুগ—খ্রীঃ পূঃ ৬০০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ৩২২ ( অর্থাৎ আরিস্ততলের মৃত্যু পর্যন্ত ) (২) গ্রীক্-রোম্যান্ যুগ—খ্রীঃ পূঃ ৩২২ হইতে খ্রীঃ ৫ম শতাব্দী পর্যন্ত—অর্থাৎ অগাষ্টিনের মৃত্যু ( ৪৩০ খ্রীঃ অঃ ) পর্যন্ত (৩) মধ্যযুগ—খ্রীঃ ৫ম হইতে ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত। (৪) সাহিত্য ও দর্শনের পুনর্জ্জীবনের যুগ ( Renaissance ) ১৫শ—১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত। ( ৫ ) আলোকধারার যুগ ( Enlightenment )—১৭শ—১৮শ শতাব্দী। (৬) জার্মান দর্শনের যুগ—কাণ্ট, হেগেল ইত্যাদি; ১৮শ শতাব্দীর শেষ হইতে ১৯শ শতাব্দীর আরম্ভ—খ্রীঃ অঃ ১৭৮১—১৮২০ .পর্যন্ত ( অর্থাৎ কাণ্টের প্রধান গ্রন্থ প্রকাশের তারিখ হইতে হেগেলের শেষ জীবন—কিন্তু মৃত্যু নয়—পর্যন্ত ) (৭) ১৯শ শতাব্দী। এই বিভাগ বিংশ শতাব্দী আরম্ভ হইবার পূর্বে করা হইয়াছিল। সুতরাং এই শতাব্দীর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর এই বিবরণ হইতে বাদ পড়িয়াছে। আরও একটা কথা; ইহাতে জার্মান দর্শনের ৪০ বৎসরকে একটা পৃথক্ যুগ মনে করিয়া জার্মান দর্শনকে যতটা প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, ততটা প্রাধান্য অধুনা অনেকে দিতে চান না। এই সব কারণে এই বিভাগে কতকটা কৃত্রিমতাও ঢুকিয়াছে। সাধারণভাবে প্রাচীন, মধ্য ও নবীন—এই যুগ-ত্রয়ই সহজ-বোধ্য এবং সকলের গ্রাহ্য; সুতরাং আমরা এই ভিত্তিতেই অগ্রসর হইব। নবীন বা আধুনিক যুগের ভিতর 'সাহিত্যের পুনর্জীবন' ও 'আলোক ধারা'র যুগও পড়িবে। কিন্তু পূর্বে উক্ত যুগ-বিভাগের মধ্যে গ্রীক্-রোম্যান যুগ বলিয়া যে একটা পৃথক্ যুগ স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার একটা সার্থকতা আছে। এই যুগে কয়েকটী বড় বড় ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। প্রথম—আরিস্ততলের

* Windelband—History of Philosophy.

মৃত্যুর অল্প পূর্বে তাঁহার ছাত্র মাকিডোনিয়ার রাজা সেকন্দর সমস্ত গ্রীস্ অধিকার করেন এবং দক্ষিণে মিশর ও পূর্বে ভারতেরও কতক অংশ লইয়া এক বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। খ্রীঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে তাঁহার ভারত আক্রমণ ভারতের ইতিহাসেও প্রসিদ্ধ ঘটনা। সেকন্দরের এই সাম্রাজ্য স্থাপনের ফলে গ্রীক্ সভ্যতা—তথা গ্রীক্ দর্শন—প্রাচ্যের সভ্যতা ও দর্শনের সঙ্গে মিলনের সুবিধা পায়। মিশরে সেকন্দরেরই নামে প্রতিষ্ঠিত আলেক্জান্দ্রিয়া নগর ক্রমশ এই মিলনের একটি বড় কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। প্রাচ্যে তখন ভারতীয় সভ্যতা ছাড়া, পারস্য, সিরিয়া প্রভৃতির সভ্যতাও ছিল; আরও ছিল ইহুদী সভ্যতা—যাহার বক্ষ হইতে কয়েক শতাব্দী পরে খ্রীষ্টান ধর্মের আবির্ভাব হয়। মিশরেও একটা প্রাচীন সভ্যতা ছিল। সভ্যতা ও দর্শনের এই মহামিলনে অনেক সহায়তা করিয়াছিল রোমক সাম্রাজ্য। সেকন্দরের সাম্রাজ্যের বিনাশের পর রোমক সাম্রাজ্য আসে। উহাও একটা শক্তিশালী সভ্যতা সঙ্গে আনে। গ্রীক্দের সাহিত্য, শিল্প ও দর্শন, ইহুদী সভ্যতা হইতে উদ্ভূত খ্রীষ্টান ধর্ম ও রোমক সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রনীতি ও একীকরণ পদ্ধতি—এই সমস্ত মিলিয়াই আধুনিক ইউরো-আমেরিকান সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে। এই রোমাঞ্চকর ইতিবৃত্তের বিচিত্র কাহিনীর স্থান আমাদের পরিসরের মধ্যে হইবে না। কিন্তু এই কয়েক শতাব্দীর মধ্যে দর্শনের রূপ ও প্রচার যে একটা নূতন আকার ধারণ করিয়াছিল, এই কথাটা আমাদের মনে রাখা উচিত হইবে। তখন গ্রীক্ দর্শন ঠিক গ্রীক্ থাকে নাই; অন্যান্য চিন্তাধারার সঙ্গে মিলিত হইয়া অনেক রূপান্তরিত হইয়া যায়।

খ্রীষ্টান ধর্মের অভ্যুদয়ের পর আর একটা বিপ্লব এই দর্শনকে আক্রমণ করে। গ্রীক্ দর্শন ও খ্রীষ্টান ধর্ম এই উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ ও সংগ্রাম, আপ্যায়ন ও মিলন—উভয়ই ঘটে। কিন্তু এমন একটা সময় আসে, যখন

ধর্ম সর্বগ্রাসী হইয়া উঠে। প্রথমে নির্যাতিত, পরে সম্রাটের অঙ্কশায়ী হইয়া এই ধর্ম দর্শনকে প্রশ্রয় দিতে অস্বীকার করে। ৫২৯ খ্রীঃ অব্দে রোমক সম্রাট্ য়ুষ্টিনিয়ান ( Justinian ) প্ল্যাতোর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দেন, উহার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন এবং অ-খ্রীষ্টান দর্শন ইত্যাদির পঠন-পাঠন নিষিদ্ধ করিয়া দেন। ইহার ফলে প্রকাশ্য শিক্ষা-কেন্দ্র ও শিষ্ট-সমাজ হইতে গ্রীক্ সাহিত্য ও দর্শনের চর্চা বিতাড়িত হয়, কিন্তু উহা বিলুপ্ত হয় নাই; রাষ্ট্রশক্তির আনাচে কানাচে আপন স্থান করিয়া লইয়া কোন প্রকারে বাঁচিয়া থাকে। একটা অন্ধকারের যুগ ইউরোপকে ছাইয়া ফেলে। পরে উত্তর-ইউরোপের বর্বরদের অর্থাৎ ফরাসী ও জার্মনদের পূর্বপুরুষদের আক্রমণে রোমক সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া যায়। কিন্তু খ্রীষ্টের ধর্ম তখন সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়াছিল; এবং অক্লেশে তখন উহা নিমজ্জমান সাম্রাজ্যের গুরুভার বহন করে এবং ইউরোপে সভ্যতাকে জীয়াইয়া রাখে। তখন ব্যক্তি ও সমাজের জীবনে ধর্মই হয় প্রধান সামগ্রী—একমাত্র সামগ্রী বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু আস্তে আস্তে আবার দর্শনের চর্চা আরম্ভ হয়। গোড়ার দিকে শুধু আরিস্ততলই সেই সম্মান পান; তাহাও আবার মূল গ্রীক্ ভাষায় ( তাঁহার নিজের ভাষায় ) নয়, স্পেনীয় আরবদের অনুবাদ ও ভাষ্য টীকার সাহায্যে। মধ্য যুগের ইউরোপে এই ভাবে আরবদের দান অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য! কিন্তু দুঃখের বিষয় ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এই যুগটীকে একান্ত অবহেলা করিয়া থাকেন। তাহার প্রধান কারণ, কতকটা নিজেদের জাতির শ্রেষ্ঠত্ব-অভিমান, আর কতকটা আরবী ভাষা ও সভ্যতায় তাঁহাদের বিরাট অজ্ঞতা। এই ভাবে দর্শন প্রচারে যে সব মুসলমান ইউরোপকে সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ইবন্-শিনা (Avicenna) ও ইবন্-রসীদ (Averroes) সমধিক বিখ্যাত।

দার্শনিক জগতের ঘন অন্ধকার ক্রমে কাটিয়া যাইতে থাকে। অ-খ্রীষ্টান গ্রীক্ ও রোমকদের—বিশেষতঃ গ্রীক্‌দের সাহিত্য, শিল্প ও দর্শনের চর্চা আবার শিক্ষিত সমাজে প্রকাশ্যে সম্মান পাইতে আরম্ভ করে। অমা-নিশার ঘন অন্ধকার ভেদ করিয়া উষার অরুণ আলোকের মত দীর্ঘ সহস্র বৎসরের ধর্মান্ধতা ও ধর্ম-শাসন ছিন্ন করিয়া প্রাচীন সাহিত্য ও দর্শন আবার জীবন লাভ করে। এই পুনর্জীবনের যুগ হইতেই আমাদের বিবরণ আরম্ভ।

## ৪। প্রতীচীর দর্শনে প্রাচীন ও নবীন

ইউরোপের আধুনিক দর্শনে একটা বিদ্রোহের ভাব স্পষ্ট। অতীতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহেই ইহার উৎপত্তি। এই অতীতের অর্থাৎ মধ্যযুগের চিন্তায় কতকগুলি ধারণা ছিল স্পষ্ট আর কতক ছিল অস্পষ্ট। নবীন চিন্তা এই অস্পষ্টকে স্পষ্ট করিয়া তুলে এবং স্পষ্টকে অবিশ্বাস করে। এইখানেই বিদ্রোহের সূত্রপাত।

প্রথমত, মধ্য যুগে অর্থাৎ ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে ধর্মের শাসন অত্যন্ত প্রবল ছিল। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য—তাহার চিন্তার ও অনুভূতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হইত না। ধর্ম তখন সংঘবদ্ধ ভাবে মানুষ কি ভাবিবে তাহাও বলিয়া দিত। কি করিবে, সে কথা সব ধর্ম-ই বলে, মধ্য যুগে খ্রীষ্টান ধর্মও বলিত। বিশ্বাসের উপরও ধর্মের শাসন থাকে না এমন নয়; মহম্মদকে আল্লার রসুল বলিয়া না মানিয়া কেহ মুসলমান হইতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া রবিবারে পান খাওয়া যায় কি না, অথবা সন্ধ্যায় ৫½ টার পর বেড়াইতে গেলে দক্ষিণ মুখে হাঁটিবে না উত্তর মুখে হাঁটিবে, ইহাও যদি ধর্ম বলিয়া দিতে চায়, তবে তাহার সে শাসন দুঃসহ হইয়া উঠে। অথচ এরূপ শাসনও ধর্ম করিয়াছে; সব ধর্মই করিয়াছে

বলিলেও ইতিহাসের বিরুদ্ধ কথা হইবে না। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য যে, এইরূপ শাসন বেশীদিন চলে না; ইহা যত কঠোর হইবে বিদ্রোহও তত ঘনাইয়া আসিবে। দেশে দেশে এবং যুগে যুগে এইরূপ বিদ্রোহ ঘটিয়াছে। মধ্য যুগের শেষ পর্যন্ত ইউরোপে ধর্মের শাসন এইরূপ কঠোর ছিল। ব্যক্তির সমস্ত জীবন ধর্মমণ্ডলী বা গীর্জা-সঙ্ঘের অন্তরালে সীমাবদ্ধ ছিল। তাহার সমস্ত বিশ্বাস এবং চিন্তা ধর্ম-যাজকদের মণ্ডলীর নির্দেশমত হইতে হইত। একটা বড় দৃষ্টান্ত এই যে, পৃথিবী এই সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্র; সূর্য ও আকাশের সমস্ত নক্ষত্রমালা পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে, এইটীও তখন ধর্মের আদেশে বিশ্বাস করিতে হইত। জার্মন পোল্ কপার্নিকস্ (১৪৭৩-১৫৪৩ খ্রীঃ অঃ) ইহার বিরুদ্ধ কথা বলেন। ইটালীতে গেলিলিও (১৫৬৪-১৬৪২ খ্রীঃ অঃ) সেই কথা সমর্থন করিতে গিয়া বিপদে পড়েন, ইহা সকলের জানা ইতিহাস। কিন্তু এই বিশ্বাস আর রোধ করা চলে নাই। বিদ্রোহ সফল হয়, ধর্মের শাসন শিথিল হইয়া পড়ে।

আরও নানা দিকে এই বিদ্রোহের বীজ ছড়াইয়া পড়ে। এই সময়ের কাছাকাছি (১৪৯২ খ্রীঃ অঃ) আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়। লোকের পৃথিবীর সম্বন্ধে ধারণা বদলাইতে আরম্ভ করে। তারপর, ইটালী ও ফ্রান্সের নগরে নগরে বিজ্ঞানের সাহায্যে নূতন কল-কব্জার আবিষ্কার হইতে থাকে; প্রকৃতির শক্তি মানুষের কাছে ধরা দিয়া তাহার কাজে নিয়োজিত হইতে থাকে। বাইবেল ও বাইবেলের অনুমোদনে আরিস্ততলের পদার্থবিজ্ঞান লোকের মনে জগৎ সম্বন্ধে যে ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিল, তাহা ক্রমশ নির্মূল হইতে থাকে। ইহাকে অনেকে নাম দিয়াছেন 'জগতের আবিষ্কার'।

বাস্তবিকই, কলম্বস্, কপার্নিকস্, কেপলার, গেলিলিও প্রভৃতির

আবিষ্কারের সমবেত ফলে মানুষ একটা নূতন জগতের সম্মুখীন হয়। ধর্মের অন্ধ অনুসরণ করিয়া ধর্ম-যাজকেরা এতদিন লোককে যাহা শিখাইয়াছিলেন, তাহা ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়। এই হইল বিদ্রোহের একটা দিক্।

অন্য দিকে নির্যাতিত ও নির্বাসিত গ্রীক্-সাহিত্য আবার আত্ম-প্রকাশ করিতে লাগিল। ভদ্র সমাজেও ইহা প্রকাশ্যে পঠিত ও আলোচিত হইতে সাহস পাইল। পাদ্রীরা প্রশ্রয় দিতেন না ; কিন্তু বিদ্রোহীদের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতে থাকে বলিয়া সে শাসন না মানা সম্ভব হইয়া পড়িল। প্রথম ইটালীতে এইভাবে প্রাচীন অ-খ্রীষ্টান সাহিত্য ও সভ্যতা পুনর্জীবন লাভ করে ; পরে ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে, জার্মনীতে এবং ইউরোপের অন্যত্রও ইহা ছড়াইয়া পড়ে। ইহার ফলে মানুষ আবার নিজেকে আবিষ্কার করে। ধর্ম শিখাইয়াছিল, মানুষ পাপী, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, ঈশ্বরের অনুগ্রহের ভিখারী হইয়া পরিত্রাতা খ্রীষ্টের উপদেশ অনুসারে কঠোর জীবন যাপন করিতে হইবে। এই জীবনে হাসি নাই, আনন্দ নাই, এমন কি, মানুষের মত কাঁদিবার অধিকারও নাই। কিন্তু প্রকৃতি প্রতিশোধ লইল ; অখ্রীষ্টান সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিয়া মানুষ আবার জানিল যে, মানুষ মানুষ ; তাহার হাসিবার কাঁদিবার অধিকার আছে, আকাশে বাতাসে সরিৎ-সাগরে-ভূধরে, প্রকৃতি তাহার সুখ-দুঃখের আয়োজন সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। গীর্জার বাহিরে একটা বৃহত্তর পৃথিবীর অনুভূতি মানুষের মনে একটা নূতনতর সুখ-দুঃখ সৃষ্টি করিল। (১) ধর্মের বিরাট ও বহু-অবয়বী শিলা-সৌধ কাঁপিয়া

---

(১) তুং "প্রকৃতির প্রতিশোধ"—রবীন্দ্রনাথ।

উঠিল। এই সেই বিদ্রোহের আর একটা দিক্ যাহা হইতে আধুনিক দর্শন আরম্ভ হয়। (১)

এই দর্শন যাঁহারা আরম্ভ করেন, তাঁহাদের মধ্যে নানা শ্রেণীর লোকই ছিলেন। অতীতে গ্রীসে সমাজের উচ্চতর এক বিশিষ্ট শ্রেণীর মধ্যেই দর্শন সীমাবদ্ধ ছিল; মধ্য যুগে গীর্জার ধর্মযাজকেরাও এক বিশিষ্ট শ্রেণীর লোক ছিলেন; দর্শন তাঁহাদের পক্ষপুটের আশ্রিত ছিল। নির্দিষ্ট এবং গীর্জার অনুমোদিত শিক্ষাকেন্দ্রে এই দর্শনের চর্চা হইত এবং ধর্মশিক্ষকেরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দর্শনশিক্ষকও ছিলেন। কিন্তু নূতন যুগ যখন আরম্ভ হয়, তখন এই সমস্ত নিয়ম ভাঙ্গিয়া যায়। তখন পাঠ্য-পুস্তক বা ভাষ্যের মত করিয়া দর্শন লেখা হইত না; তখন প্রবন্ধের আকারে উহা প্রকাশ পাইতে থাকে। আর নানা শ্রেণীর লোক এই প্রকাশে ও প্রচারে নিজেদের চিন্তা ও লেখা দ্বারা সহায়তা করেন। এই যুগের দার্শনিকদের মধ্যে রহিয়াছেন, সংঘ হইতে পলায়িত সন্ন্যাসী, যেমন ব্রুনো (Bruno), রাজ্যের প্রধান বিচারপতি, যেমন বেকন্ (Bacon), চর্মকার, যেমন বেহ্‌ম্ (Boehme), নির্বাসিত ও সমাজচ্যুত ইহুদী, যেমন স্পিনোজা (Spinoza) এবং রাজদূত, জমিদার ইত্যাদি। (২) এই নূতন দর্শনের প্রথমে কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না।—কোন নির্দিষ্ট শিক্ষা-কেন্দ্রও ছিল না। যে যেখানে থাকিত সে সেইখানেই এবং যে যে কাজে থাকিত সে তাহারই অবসরে দর্শন লিখিত; আর, বই বাহির হইয়া গেলে যে কোন জিজ্ঞাসু উহা পড়িত। ১৮শ শতাব্দীর

(১) Erasmus প্রণীত "Praise of Folly" এবং ঐ সময়ের 'বিদূষক'-সাহিত্যের অন্যান্য গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। (২) Windelband—History of Philosophy p. 7.

শেষার্দ্ধে দর্শন বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার স্থান করিয়া লয়; প্রথমত জার্মনীতে উহা ঘটে, পরে স্কটল্যাণ্ড, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইটালীতেও তাহাই হয়। ১৯শ শতাব্দী হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ই বলিতে গেলে দর্শনের একমাত্র আবাসভূমি হইয়া রহিয়াছে।

এই দর্শনের সৃষ্টিতে ইউরোপের সকল জাতিরই দান সমান নয়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী ও জার্মনীই প্রধানতঃ স্রষ্টা; অন্য দেশের লোকেরা দর্শন গ্রহণ করে, এই মাত্র। উত্তর ইউরোপ—ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, নরওয়ে এবং পূর্ব ইউরোপ বা রুশিয়া—দর্শনে উল্লেখযোগ্য কোন কৃতিত্বই এখন পর্যন্ত দেখাইতে পারে নাই। স্পেন—পর্তুগ্যালও নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকাও অগ্রণী হইয়া আসে এবং এখনও সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের কোন কোন শাখার প্রচুর চর্চা হইয়া থাকে।

## ৫। দুই ধারা

দার্শনিক চিন্তার ইতিহাসে কয়েকটী সুস্পষ্ট ধারার সাক্ষাৎ আমরা পাই। সোজা ভাষায় ইহাদের নাম দেওয়া যায় (১) অতি বিশ্বাস (২) অবিশ্বাস এবং (৩) সংশয় ও সিদ্ধান্ত। অনেক সময় মানুষের মন বিশ্বাসে ভরপুর থাকে; জগৎ সত্য, আমি সত্য, ঈশ্বর আছেন; শাস্ত্র যাহা বলে—বেদ বা বাইবেল বা কোরাণ—সব অভ্রান্ত; ঋষিরা বা ধর্মপ্রচারকেরা অতুলনীয় সত্যদ্রষ্টা; তাঁহাদের বাণীর উপরে কোন কথা চলে না; এই সমস্ত বিশ্বাস করিয়া জগৎ এবং জগতে নিজের স্থান মানুষকে বুঝিয়া লইতে হইবে। ইহাও একরকম দর্শন—ইহাও দর্শনের একটা ধারা। আবার, জীবনের পরিবর্তনে ইতিহাসের ঘটনায়, নূতন অভিজ্ঞতায় অনেক সময় এই বিশ্বাস মানুষের টলিয়া যায়। পুণ্যের ফল না পাইলে, অত্যাচারের প্রতীকার না হইলে,

পাপীর জীবনে ঐহিক সাফল্য দেখিলে ধর্মে বিশ্বাস মানুষের অদৃঢ় হইয়া যায়; আর, বিদ্যুৎকে ধরিয়া আলো জ্বালাইতে পারিলে অশনির অধিকারী ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব শিথিল হইয়া যায়; সাগর পাড়ি দিয়া নূতন পৃথিবী আবিষ্কার করিলে পুরাতন-ভূগোল অবিশ্বসনীয় হইয়া পড়ে; এইভাবে নানাদিক্ দিয়া গৃহীত জ্ঞান ও বিশ্বাস যখন রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে, তখন দর্শনে একটা অবিশ্বাসের যুগ আসে; নিজের জানিবার শক্তিতে মানুষ আস্থাহীন হইয়া পড়ে; সত্য তখন অজ্ঞেয় বলিয়া মনে হয়; ইহাও দর্শনের একটা ধারা;—কখনও কখনও দেখা দেয়। কিন্তু শুধু 'জানি না' বলিলে জীবন যাত্রাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। পায়ের নীচে মাটী আছে? যে বলিবে হয়ত আছে, হয়ত নাই—তাহার ত আর পথ চলা হইবে না। সুতরাং অবিশ্বাসের যুগ দর্শনের ইতিহাসে কখনই দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। অবিশ্বাস ঠিক দর্শন নয়। ইহা পূর্বতন বিশ্বাসের গোড়া কাটিয়া দেয়; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নূতন বিশ্বাসের গোড়াপত্তনও করে। উদ্রিক্ত সংশয়ের বিচার করিয়া মানুষকে আবার সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হয়। সুতরাং দর্শনের প্রকৃতপক্ষে দুইটী ধারা; এক অতিবিশ্বাস,—নিঃসন্দেহ, দ্বিধাশূন্য, নির্বিচার বিশ্বাস; আর, দ্বিতীয়, সংশয়ান্তে বিচারিত সিদ্ধান্তে বিশ্বাস। সংশয়, বিচার ও সিদ্ধান্ত—পাশ্চাত্ত্যের আধুনিক দর্শনের ইহাই একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—ইহাই তাহার প্রকৃতপক্ষে পরিচায়ক গুণ। কিন্তু ইহার মধ্যেও আবার দুইটী পৃথক্ পন্থা লক্ষ্য করা যায়। সংশয়ান্তে—পূর্বের গৃহীত মত পরিত্যাগ করিয়া নূতন সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার জন্য বিচার কোথায় এবং কিভাবে আরম্ভ করিতে হইবে তাহা লইয়াই এই প্রভেদ সৃষ্ট হইয়াছে।

পাশ্চাত্ত্যের আধুনিক দর্শন আরম্ভ হয়—১৬শ শতাব্দীর মধ্য হইতে। তিনজন দার্শনিকের নাম এই আরম্ভের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত; ইটালীর

ব্রুনো ( ১৫৪৮—১৬০০ খ্রীঃ অঃ ), ইংলণ্ডের বেকন ( ১৫৬১—১৬২৬ ) আর ফ্রান্সের দ্য-কার্তে ( ১৫৯৬—১৬৫০ )। ইঁহাদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই, অনেকটা তাহারও পূর্ব হইতেই—ইউরোপের মধ্য-যুগীয় চিন্তার অবসান ঘটে। মধ্যযুগের চিন্তা ছিল অতিবিশ্বাসের এবং অন্ধবিশ্বাসের চিন্তা। যে নূতন চিন্তাধারা ইঁহাদের সময়ে গৃহীত হয়, তাহাতে অতীতের অন্ধবিশ্বাস বর্জিত হইয়া যায়। বিশেষ করিয়া গীর্জার অনুমোদিত আরিস্ততলের ব্যাখ্যার উপর যে দর্শন প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা আর টিকিতে পারে নাই। এই নূতন আরম্ভে একটা জিনিস স্পষ্ট হয় এই যে, মানুষ ও বাহ্য প্রকৃতি উভয়ই সত্য। মধ্যযুগের চিন্তায় এই বাহ্য প্রকৃতিকে জানিবার তেমন কোন চেষ্টা হয় নাই। কিন্তু কেপ্লার, গেলিলিও প্রভৃতির আবিষ্কারের পর, কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের এবং নিউটন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের নব নব অবদানের পর, বাহ্য জগৎকে নগণ্য মনে করা আর সম্ভব ছিল না। বেকন বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতিকে বশ করার সম্ভাবনার উপর জোর দিয়া সুর ধরিলেন, জ্ঞানই শক্তি; প্রকৃতির অবগুণ্ঠিত সত্য যতই উদ্ঘাটিত হইবে, মানুষের শক্তি—তাহার ভোগের ও স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন—ততই বাড়িয়া যাইবে; জীবনের সুখ ও শান্তি বিঘ্নহীন হইয়া যাইবে। মোক্ষের জন্য নয়—জীবনের দুঃখ এড়াইবার জন্য নয়—জীবনকে সুখময় করিবার জন্য, বাহ্য জগতের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য জ্ঞান প্রয়োজন। প্রকৃতিকে জানিতে হইলে শুধু ঘরে বসিয়া চিন্তা না করিয়া চক্ষু কর্ণ লইয়া তাহার সম্মুখীন হইতে হইবে। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সুপরিচালিত ব্যবহার দ্বারা নূতন নূতন সত্য—অজ্ঞাত-পূর্ব সত্য—আবিষ্কার করিতে হইবে। এই জ্ঞানার্জনে চক্ষু কর্ণ প্রভৃতির ব্যবহারই প্রধান সহায়, ইহা মনে রাখিতে হইবে। জ্ঞান শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়-লভ্য অভিজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন হয়। বেকন এই মতটা প্রচলিত

করেন ; এবং ইংলণ্ডে এবং অন্যত্রও অনেকে ইহা গ্রহণ করেন। ইহার একটা পারিভাষিক নাম দেওয়া হইয়াছে। উহার বঙ্গানুবাদ করিলে 'বাদান্ত' একটা নূতন শব্দ সৃষ্টি হইবে কিন্তু বুঝিবার পক্ষে বিশেষ কোন সুবিধা হইবে না। তাহার উপর এই নূতন 'বাদান্ত' নাম সকলের পছন্দ না-ও হইতে পারে। সুতরাং এই প্রকার 'বাদ' বাদ দেওয়াই আমাদের পক্ষে শুভ।

যদি ইংলণ্ডের দর্শনকে ইউরোপীয় দর্শন হইতে পৃথক্ করা হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, ইংলণ্ডে বেকন প্রবর্তিত এই মত—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের উৎস—এই 'বাদ'টী অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু ইংলণ্ড ও ইউরোপের মধ্যে যে এক টুকরা সমুদ্র আছে তাহার পারাপারের ব্যবস্থা জুলিয়স্ সীজরের সময় হইতেই ছিল ; আর, ইংলণ্ডের লোকদের—বিশেষতঃ বড় লোকদের গ্রীক্ ও রোম্যান সভ্যতার লীলাস্থল ইটালী ভ্রমণ অনেক সময় উচ্চ শিক্ষার অঙ্গ বিবেচিত হইত। সুতরাং ইংলণ্ড যদিও অনেক বিষয়ে তাহার সভ্যতার দ্বৈপ চরিত্র রক্ষা করিয়াছে, তথাপি তাহার দর্শন বৃহত্তর ইউরোপের দর্শনের সঙ্গে বারবার মিশিয়া গিয়াছে। ইউরোপের—বিশেষতঃ জার্মনীর দর্শন হইতে ইংলণ্ডের দর্শনকে যে পৃথক্ করা যায় না, তাহা নয় ; তবে, এরূপ প্রভেদের উপর বেশী গুরুত্ব দিলে শ্রেণী বিভাগ অনাবশ্যকরূপে দীর্ঘ হইয়া যাইবে। সাধারণভাবে এই পর্যন্ত বলা যায় যে, বেকন প্রবর্তিত রীতি অনুসারে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার মূল্য বেশী মনে করা এখন পর্যন্ত ইংলণ্ডের দর্শনের একটা বৈশিষ্ট্য। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইহাই একটা প্রসিদ্ধ ধারা।

কিন্তু মানুষ শুধু কতকগুলি ইন্দ্রিয়ের সমষ্টি নয়। তাহার চিন্তা করিবার শক্তি আছে। সে শক্তি যদি তাহার না থাকিত, তাহা হইলে কেবল ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হইতে তাহার পক্ষে বিজ্ঞান-সৃষ্টি সম্ভব হইত না। ইন্দ্রিয় ত পশু

পক্ষীরও আছে; শীত-গ্রীষ্ম, আলো-অন্ধকার ত তাহারাও অনুভব করে; কিন্তু গেলিলিও-নিউটন ত তাহাদের মধ্যে এখনও আবির্ভূত হন নাই। আরও একটা কথা; ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান সত্যকার জ্ঞান নয়—বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নয়; দেখি যখন তখন একটা বৃক্ষ দেখি, বৃক্ষত্ব দেখি না; দ্রব্যের সামান্য গুণ যাহা—যাহা বিজ্ঞানের বিচার্য—তাহা ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার পরে চিন্তা দ্বারা জানিতে হয়। সুতরাং প্রকৃতিরই হউক অথবা মানুষেরই হউক, উভয়ের উচ্চতর জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন চিন্তা। ইহাও একটা প্রবল মত; পাশ্চাত্ত্যে অনেকে গ্রহণ করিয়াছেন। 'বাদ'-শব্দ শেষে রাখিয়া ইহাকেও একটা নাম দেওয়া যায়; কিন্তু মনে হয়, তাহা নিষ্প্রয়োজন।

ইন্দ্রিয় এবং চিন্তা—জ্ঞানের মূল হিসাবে ইহাদের কোন্‌টার মূল্য বেশী, তাহা লইয়া মতভেদ হইয়াছে। নবযুগের পাশ্চাত্ত্য দর্শনের গোড়ার দিকে এই দুইটী ধারা স্পষ্ট হইয়া উঠে; প্রথমটি ইংলণ্ডে, দ্বিতীয়টী ফ্রান্সে; প্রথমটী প্রবর্তিত করেন বেকন, দ্বিতীয়টীর প্রবর্তক দ্যকার্তে।

ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ আর মানবাত্মার স্বকীয় চিন্তাশক্তি—এই দুইটীর মধ্যে কোন্‌টীর দ্বারা জগৎকে ভাল করিয়া জানা যায় তাহা লইয়া তর্ক হইয়াছে। মীমাংসা হওয়ার পূর্বে দুইটীই পৃথক্ পন্থা হিসাবে অনুসৃত হইয়াছে;—একটীকে যাঁহারা অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহারা অপরটীর কোন মূল্য স্বীকার করেন নাই। ফলে কিছুকাল পর্যন্ত দুইটী ধারা দুইটী জলস্রোতের মত পৃথক্‌ই রহিয়া গিয়াছে। উভয়ত্র সিদ্ধান্তও এক হয় নাই।

১। ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষকে জ্ঞানের একমাত্র মূল মনে করার ফল এই হইয়াছিল যে, জন্মকালে মানুষের মন এক টুকরা সাদা কাগজের সঙ্গে তুলিত হইতে লাগিল। প্রাচীনদের মধ্যে কেহ কেহ (যেমন প্ল্যাতো) এবং পরেও কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে মানুষের মন জ্ঞানে ভরিত থাকে; ক্রমশ অনুকূল অবস্থায় উহা স্ফূর্ত হয় মাত্র। অর্থাৎ ত্রিভুজের জ্ঞান বা পরাবৃত্তের

জ্ঞান সকলের মনেই অনাদি কাল হইতে রহিয়াছে। আলোচনা বা উপদেশ গ্রহণ আরম্ভ করিলেই উহা প্রকাশ পাইতে থাকিবে। জ্ঞান সত্য সত্য বাহির হইতে আসে না; উহা ভিতরেরই জিনিস; মানবাত্মার অনাদি সম্পদ্। অবস্থা অনুকূল ন' হওয়া পর্যন্ত উহা চাপা থাকে, এই মাত্র। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান অর্থে নূতন কিছু অর্জন করা নয়, চির-সঞ্চিত কিন্তু অধুনা-বিস্মৃতকে স্মরণ করা মাত্র।

ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষের দাম যাঁহারা বড় করিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের পক্ষে এই ধরণের মত গ্রহণ করা অসম্ভব হইল। তাঁহাদের মতে মন কিছুই লইয়া আসে না, শুধু জ্ঞান অর্জন ও রক্ষা করিবার শক্তিটী মাত্র আনে। জন্মের পর হইতে বাহ্য জগতের সঙ্গে তাহার ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যস্থতায় অবিরাম একটা সম্পর্ক চলিতে থাকে; চক্ষু, কর্ণ, ত্বক্ প্রভৃতি অনবরত বাহিরের সংবাদ তাহাকে পৌঁছাইয়া দিতে থাকে; তাহারই ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্তূপ ক্রমশ গঠিত হইতে থাকে। সমস্ত জ্ঞান বাহির হইতে মন সংগ্রহ করে, সঙ্গে সে কিছুই আনে না, এই একটা মত দর্শনে স্পষ্ট হইয়া উঠে।

২। ইহার বিরুদ্ধ মত এই হওয়া উচিত ছিল যে, ইন্দ্রিয় প্রকৃত জ্ঞান কিছুই দিতে পারে না; জ্ঞান মনের চিরন্তন সম্পত্তি; এই জ্ঞান বিস্মৃত হয়, কিন্তু একেবারে বিলুপ্ত কথনই হয় না; বাহ্য জগৎকে জানা অর্থ বিস্মৃতকে মনে করা মাত্র; প্রিয়জনের চেহারা হয়ত ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু অনুরূপ একটা চেহারা দেখিলে উহা মনে হইতে পারে ত? তেমনই, চিরকাল মনে যে বৃক্ষের বা নক্ষত্রের বা প্রেমের জ্ঞান অঙ্কিত আছে, তাহা জন্ম-মৃত্যুরূপ সাময়িক কারণে একটু ঝাপ্সা হইয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু যেইমাত্র স্মৃতির সহায়ক কিছু ইন্দ্রিয় দ্বারা লাভ করা যাইবে, যেমন কোন গাছ দেখা যাইবে, তখনই সেই প্রাচীন ও সনাতন জ্ঞান আবার স্ফূর্ত হইয়া উঠিবে। ইহা ছিল প্ল্যাতোর মত। কিন্তু নবীন যুগের পাশ্চাত্ত্য দর্শন এই মত ঠিক

গ্রহণ করে নাই। ইন্দ্রিয়কে জ্ঞানের মূল যাহারা মানে নাই, তাহারা মানুষের চিন্তাশক্তিকে সেই মূল মনে করিয়াছে। চিন্তা দ্বারা জ্ঞান লাভ করিতে হয়; ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতা হইতে নয়। কিন্তু জ্ঞান এই-জীবনেই অর্জন করিতে হয়, পূর্বের সঞ্চিত সম্পত্তি নয়। ইহা প্ল্যাতোর বিরুদ্ধ কথা নয়; বরং আংশিক ভাবে তাঁহারই মত; তবে তাঁহার সম্পূর্ণ মত নয় এই পর্যন্ত। এই মত অনুসারে মানবাত্মার একটা নিজস্ব চিন্তাশক্তি আছে; তাহার সদ্ব্যবহার দ্বারাই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায়। কিন্তু এই জ্ঞান লাভ করিতে হয়, পূর্ব-লব্ধ নয়; আর এই জ্ঞান অর্জনে যথাযথভাবে ব্যবহৃত হইলে ইন্দ্রিয় কতকটা সহায়তাও করিতে পারে।

আমি যদি সব কিছু অবিশ্বাস করি—বাহ্য জগৎ, বাইবেল, ঈশ্বর ইত্যাদি—সমস্তই যদি না মানি—তথাপিও প্রমাণ হইবে যে আমি আছি; সন্দেহ করি, অবিশ্বাস করি, অর্থাৎ চিন্তা করি, সুতরাং আমি ত আছি! না হইলে চিন্তা করে কে? আমার চিন্তার শক্তি আছে, তাহা হইতেই আমারও অস্তিত্ব প্রমাণ হয়। আমার ভিতরে ঈশ্বরের একটা ধারণা আছে। একটা জগতের ধারণাও আমার আছে। ভাবি, উহা ঈশ্বর-সৃষ্ট। ঈশ্বর সত্য ময়; মিথ্যার ধারণা তিনি সৃষ্টি করেন নাই। সুতরাং জগৎও আছে। এই ভাবে ক্রমশ বাহ্য জগৎ ইত্যাদি সমস্তই আবার ফিরাইয়া আনা যায়। এই ধরণের চিন্তা অনুসরণ করেন ফরাসী দার্শনিক দ্য-কার্তে। এইটীকেই আমরা নবীন যুগের পাশ্চাত্ত্য দর্শনের দ্বিতীয় ধারা বলিয়াছি।

ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত দ্বীপ ইংলণ্ডে ও মহাদেশ ইউরোপে এই দুই চিন্তাস্রোতের সংযোগ বিয়োগের ফলে দর্শনের প্রবাহ বিপুল কলেবর ধারণ করিতে থাকে।

## ৬। জ্ঞান ও জ্ঞেয়

প্রশ্নটা প্রথম জ্ঞানের উৎপত্তি লইয়াই উঠে। কিন্তু ক্রমে জ্ঞেয় বস্তুর সত্তা ও স্বরূপের কথাও আলোচ্য হইয়া পড়ে। অর্থাৎ আমরা কি ভাবে জানি এবং কি জানি, এই দুইটাই আলোচ্য বিষয় হয়; এবং উভয়ত্রই ভিন্ন ভিন্ন মতের আবির্ভাব হয়।

প্রথমত জ্ঞানের কথাটাই ধরা যাক্। ইন্দ্রিয়কেই যাঁহারা জ্ঞানোৎপত্তির একমাত্র উপায় মনে করিলেন, তাঁহাদের পক্ষে একটা বিচার্য এই হইল যে, মানুষের মনে সহজাত কোন ধারণা আছে কি না। ইন্দ্রিয় দ্বারা যে বাহ্য-জগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক স্থাপন হয় এবং কতক জ্ঞান যে সেই পথেই আমাদের মনে আসে, ইহা একেবারে অবিশ্বাস কদাচিৎ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন হইল, সমস্ত জ্ঞানই কি সেইভাবে আসে, না, কতকটা—কোন কোন ধারণা মন সঙ্গে লইয়া আসে। আদি হইতেই মনে যদি কোন ধারণা থাকে, তবে তাহাকে সহজাত ধারণাই বলিতে হইবে; কেননা, মনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই উহা প্রকাশ পায় এবং এ জীবনে উহা সংগৃহীত হয় না। এমন কোন ধারণা আদৌ আছে কি? অনেকে উত্তর দিলেন, নাই; আবার কেহ কেহ বলিলেন, কোন কোন ধারণা আছে, যেমন গণিত ও জ্যামিতির সত্য—যাহা বাহ্যজগৎ হইতে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অর্জন করা সম্ভব নয়। ঈশ্বর সম্বন্ধেও আমাদের একটা ধারণা আছে; ইহাও ইন্দ্রিয়-লব্ধ বাহ্য জগতের জ্ঞান দিতে পারে না। এইসব সহজাত ধারণা ঈশ্বরই মানুষের মনে স্থাপিত করিয়াছেন। সুতরাং ইহাদের সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করা চলে না। ঈশ্বর মিথ্যা জ্ঞান দিবেন, ইহা কল্পনার অতীত। এই মত ইংলণ্ডে গৃহীত হয় নাই। ইংরেজ দার্শনিক লক্ (Locke) ইহা যে শুধু গ্রহণ করেন নাই, তাহা নহে; বিপুল উৎসাহের সহিত ইহার অসত্যতা প্রমাণেরও চেষ্টা করিয়াছেন।

এই সঙ্গে আরও একটা প্রশ্ন উঠে। আমাদের মনুষ্যত্ব, বৃক্ষত্ব প্রভৃতি সামান্য বস্তুর ধারণা আছে; কিন্তু আমরা চোখে দেখি কোনও একজন মানুষ অথবা কোনও একটা বৃক্ষ; সামান্যের ধারণা তবে আমরা পাই কোথায়? যাহারা সহজাত ধারণার অস্তিত্ব মানে, তাহাদের উত্তর সহজ; মনের এই সকল ধারণা নিজস্ব সম্পত্তি—ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জিত নয়, জন্ম হইতেই—অথবা কাহারও মতে, অনাদি কাল হইতেই—মনেতে উহারা রহিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা—যেমন ইংরেজ দার্শনিকেরা—মনের সহজাত কোন জ্ঞান আছে বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহাদের কী উত্তর? দুই উত্তর হইতে পারে, এবং দুইটীই হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পরপর একাধিক ব্যক্তি জানিয়া জাতির ধারণা মন নিজের শক্তিতে রচনা করিতে পারে। রাম, রহিম, যদু, করিম প্রভৃতি অনেককে দেখিয়া মানুষ জাতির বা মনুষ্যত্বের সামান্য গুণের ধারণা হইতে পারে; সেই সাধারণ ধারণাটী জাতি। ইহা মনের সৃষ্টি। এই হইল আমাদের প্রশ্নের এক উত্তর। আর এক উত্তর, সত্যসত্যই এইরূপ জাতির বা সামান্যের ধারণা আদৌ আমাদের নাই; আমরা মনে করি বটে, যে উহা আমাদের আছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাহা আছে তাহা একটী সাধারণ নাম মাত্র—মানুষ, বৃক্ষ ইত্যাদি। এই নামটীও অবশ্যই মানুষেরই সৃষ্টি। যখন এই নাম ব্যবহৃত হয়, তখন, আমাদের মনে আসে কোনও একটী ব্যক্তির প্রতিবিম্ব; 'মানুষ' বলিলে মনে আসিবে রাম কিংবা রহিমের মূর্তি; মানুষের কোন সাধারণ মূর্তি নাই—জাতির কোন ধারণাও আমাদের মনে আসে না। নামটী মাত্র সাধারণ। এই হইল প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তর। বাহ্য জগতে জাতি নাই; আছে শুধু এক, দুই, তিন, অনেক ব্যক্তি। মনেও কোন জাতি-বোধক ধারণা নাই; আছে শুধু বিবিধ ব্যক্তির প্রতিকৃতি। সকলের সাধারণ আছে শুধু একটি নাম—যেমন মানুষ, বৃক্ষ, নক্ষত্র ইত্যাদি। এই প্রশ্ন এবং এই

সকল উত্তর অনেক কাল পাশ্চাত্ত্য দর্শনে বেশ প্রবল ছিল; আদিম যুগে ও মধ্যযুগেও ছিল এবং এখনও অন্য আকারে রহিয়াছে।

জ্ঞান কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের দান, এই মত গ্রহণ করার ফলে জ্ঞেয় বস্তুর বা বাহ্য জগতের কি গতি হইবে? বৃক্ষত্ব বা মনুষ্যত্ব এইরূপ যে জাতি তাহা যদি বাহ্য জগতেও না থাকে, মনেও না থাকে এবং শুধু 'বৃক্ষ', 'মানুষ' প্রভৃতি নামটীই যদি সাধারণ হয়, তবে জগৎ কিরূপ দাঁড়াইবে? উত্তর সোজা; শুধু কতকগুলি অচিরস্থায়ী ব্যক্তির সমষ্টি! কিন্তু এইখানেই চিন্তাসূত্র ছিন্ন করিয়া দেওয়া যায় না। ইন্দ্রিয় আমাদিগকে জাতির জ্ঞান দেয় না, দেয় শুধু ব্যক্তির জ্ঞান—আমরা বৃক্ষত্ব দেখি না, দেখি এই কিংবা ওই বৃক্ষটী—ইহা বলিলেই শেষ কথা বলা হইল না। এই বৃক্ষটীই আমি কি করিয়া জানি? জ্ঞান ত আমার মনের ভিতর; বৃক্ষটী ত আর সেখানে নয়, বাহিরে! মনে যে বৃক্ষ আছে, সে বস্তুটী কি এবং কি ভাবে উহার উৎপত্তি?

বাহ্য জগৎ আছে কি না, উহাকে আমরা জানিতে পারি কি না, শুধু প্রতিকৃতি জানি, না প্রকৃত রূপ জানি অথবা বিকৃতভাবে জানি—ইত্যাদি নানা প্রশ্ন এই সম্পর্কে উঠিতে পারে এবং উঠিয়াছে। এখনও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের এই আলোচনায় যথেষ্ট সূক্ষ্ম বিচার রহিয়াছে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি অর্থাৎ ১৭শ শতাব্দীতেও এই প্রশ্ন প্রবলভাবে আলোচনা দাবী করিয়াছিল।

কৃষ্ণের বাঁশী কাণের ভিতর দিয়া কাহারও মরমে প্রবেশ করিতে পারে, হয় ত; কি কাণ কিংবা চক্ষুর ভিতর দিয়া কিংবা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া জাতির জ্ঞান সম্ভব নয়, ইহা স্বীকৃত; কোন ব্যক্তির, এই সম্মুখের বৃক্ষটীর জ্ঞানই বা কি করিয়া হয়? ধরিয়া লইলাম, বৃক্ষ বাহিরে আছে। কিন্তু আমার ভিতরে আমার মরমে—কি প্রবেশ করে? ওখান

হইতে আলোক-রশ্মি আসিয়া চক্ষুতে পড়ে; সোজা কথা; চক্ষুর পিছনের পর্দায় অথবা ঝিল্লীতে একটা প্রতিকৃতি উৎপন্ন হয়, ইহাও প্রমাণ করা যায়; আমরা ঐ প্রতিকৃতি দেখিয়া তাহা হইতে বাহিরের বৃক্ষ জানি কি? হইতে পারে; না-ও হইতে পারে। তবে, একটা সিদ্ধান্ত এই দাঁড়াইল যে, বাহিরের জগতকে সোজাসুজি আমরা জানি না; হয় চোখে প্রতিফলিত প্রতিকৃতির, নয় ত ইন্দ্রিয়ের উপর আলোক রশ্মির ক্রিয়ার ফলে মনে উৎপন্ন কোন প্রতিকৃতির মধ্যস্থতায় উহা জানি। তাহা হইলে, আগে একটা কিছু জানি—একটা কিছুর ছায়া মনে পড়ে; পরে উহারই ব্যাখ্যা দ্বারা আমরা জগৎকে জানি।

## ৭। দ্রব্য ও গুণ

এইখানে আরও একটা কথা তুলিতে হইতেছে। দ্রব্যকে যে আমরা জানি, তাহা তাহার গুণ দ্বারা। সাম্‌নে একটা ফুল রহিয়াছে, জানিতেছি; কিন্তু কি ভাবে? কোনও এক ইন্দ্রিয় অন্য-নিরপেক্ষ হইয়া আমাকে ফুলের জ্ঞান দিতে পারে না; উহার মনোরম স্পর্শ অনুভব করি ত্বক্ দ্বারা, বর্ণ জানি চোখের সাহায্যে আর গন্ধ জানি নাকের অনুগ্রহে। সমস্ত ফুলটীকে জানি তবে কোন্ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে? রূপ-স্পর্শ-ঘ্রাণ এক সঙ্গে জানিবার মত কোন ইন্দ্রিয় ত আমাদের নাই। অথচ, ফুল জানি যখন তখন এই সবই ত জানি। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, এক একটী ইন্দ্রিয় এক একটি গুণের জ্ঞান দেয় আর মন পাকা গিন্নীর মত সব সংগ্রহ করিয়া ভাঁড়ারে সঞ্চয় করে। তাহা হইতেই আমাদের দ্রব্যের জ্ঞান হয়। এইখানে অনেক তর্ক আছে। মনের এত বড় সঞ্চয়নের শক্তি আছে কি না; গুণগুলি পৃথক্‌ভাবে জানিলে ত দ্রব্য জানা হয় না; কিভাবে গুণরাশি সঞ্চয়িত হইলে দ্রব্য হয়? এই সব তর্ক অনেকটা

মনোবিদ্যার আলোচ্য ; আমাদের পক্ষে এখানে সে সবের উল্লেখই যথেষ্ট, মীমাংসা নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু আরও একটা কথা আছে, যাহা মনোবিদ্যার উপর চাপাইয়া দেওয়া অন্যায় হইবে। দ্রব্যের সব গুণই কি আমরা দ্রব্যেতে আছে মনে করিতে পারি ? একটা কাঁসার বাসনে শক্ত কিছু দিয়া বাড়ি দিলে শব্দ হয়। শব্দটা কি ঠিক্ বাসনেরই গুণ ? ঐখানেই থাকে ? এই প্রশ্ন উঠিয়াছে ; কারণ পদার্থ বিদ্যা বলে, বাড়ি দিলে বাসনটি কাঁপে ; তাহার ফলে উহার চারিদিকের বায়ুও কাঁপে ; বায়ুর কম্পন চারিদিকে প্রসারিত হইয়া নিকটবর্ত্তী কাহারও কাণে প্রবেশ করে ; সেখানে কাঁপিবার মত পর্দা-বিশেষ আছে ; ঐ পর্দার কম্পনই পর্দার ও কাণের মালিক 'শব্দ' বলিয়া জানে। সুতরাং শব্দের আবাস কাঁসায় নয়, কাণে ; আরও সূক্ষ্মভাবে বলিলে বলিতে হয়, মনে। উহাকে আমরা শব্দায়মান দ্রব্যের গুণ বলি বটে ; কিন্তু মুখ্যত নয়, গৌণভাবেই উহা দ্রব্যের গুণ। দ্রব্যেতে থাকে শুধু কম্পন ; শব্দ থাকে শ্রোতার মনে। আরও একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্। বাহ্য জগতে চোখে দেখা যায় এমন সব দ্রব্যেরই একটা বর্ণ আছে ; বর্ণকেও আমরা দ্রব্যের গুণ মনে করি ; কিন্তু ইহাও মুখ্য গুণ নয়, গৌণ গুণ। পদার্থ-বিদ্যা বর্ণের ব্যাখ্যা করে। আলোক-রশ্মি বিশেষভাবে কোনও এক বেগে, কোনও এক রকমের ঢেউয়ে বিচ্ছুরিত হইলে চোখে আসিয়া—চোখের পিছনের পর্দায় পড়িয়া বর্ণের অনুভূতি সৃষ্টি করে। বর্ণ ঠিক্ দ্রব্যের গুণ নয় ; যে অনুভব করে, তাহার চোখ ও তৎসন্নিহিত স্নায়ু-মণ্ডলীর ক্রিয়ার ফল মাত্র। দ্রব্যেতে অবশ্য একটা বৈশিষ্ট্য আছে যাহার ফলে উহা ঐ রকমের ক্রিয়া দ্রষ্টার চক্ষুতে উৎপন্ন করে ; দ্রব্যের বিভিন্ন বর্ণের অর্থ উহার ঐ প্রকার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আসল কথা এই যে, বর্ণের কারণ দ্রব্যেতে আছে, বর্ণ নয় ; আমরা যে দ্রব্যেতে বর্ণ

আছে মনে করি, উহা গৌণভাবে সত্য, মুখ্যত নয়। দ্রব্যের স্বাদ সম্বন্ধেও ঠিক এই কারণে ঐ একই সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

আরও একটা বড় কথা, সৌন্দর্য; উহাও ত আমরা দ্রব্যের গুণ বলি। কিন্তু সৌন্দর্যও সুন্দর বস্তুতে নয়, অনুভবিতার মনে বাস করে; দৃষ্টির ও শ্রুতির ভঙ্গির উপর নির্ভর করে। কিন্তু দ্রব্যের গুণ কিংবা আকার সম্বন্ধে এরূপ কথা বলা চলে না। দ্রব্যেতে যে সকল পরমাণু আছে তাহাদের একটা বিশিষ্ট বিস্তৃতির উপর উহার আকার নির্ভর করে; আর ঐ সকলের উপর পৃথিবীর আকর্ষণই উহার ওজন নির্ধারিত করে। কাজেই আমাদিগকে সিদ্ধান্ত করিতে হয়, দ্রব্যের গুণ দুই প্রকার; কতকগুলি মুখ্য—দ্রব্যেতেই তাহাদের নিবাস; কেহ অনুভব করুক বা না করুক, উহারা সব সময়ই দ্রব্যে থাকে; যেমন ওজন, আকার ইত্যাদি। আর কতকগুলি গুণ গৌণ; দ্রব্যেতে তাহাদের কারণ থাকে, কিন্তু তাহারা বাস করে অনুভবিতার মনে; শ্রোতা না হইলে শব্দ নাই, দ্রষ্টা না থাকিলে সৌন্দর্যই হয় না। ইংলণ্ডের চিন্তায় এই সিদ্ধান্ত ১৭ শতাব্দীতে চালু হইয়া গিয়াছিল।

তার পর? বাহ্য জগতের দ্রব্য সকলের কতক গুণ যদি মনের সৃষ্টি হয়, তবে সবগুলি নয় কেন? বাহির হইতে কিছু আসিয়া মনের দরজায় আঘাত করিলে আমরা যদি শব্দ শুনি বা বর্ণ দেখি, তবে তেমনই ভাবে একটা কিছুর আঘাতে দ্রব্যের আর সব গুণও জানি, ইহা বলিতে আপত্তি কী? বাহিরে দ্রব্যজাত-সমন্বিত একটা বড় জগৎ আছে, ইহা না মানিলে চলে না? রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ, আকার, প্রকার, ভার ইত্যাদি সব গুণই মনে উৎপন্ন হয়; জড়ের আঘাত ছাড়াই উৎপন্ন হয়, এরূপ বলা যায় না? শব্দ যখন শুনি অথবা গন্ধ যখন পাই, তখন কী ঘটে? দ্রব্যটীত আর ইন্দ্রিয়ের উপর আসিয়া পড়ে না কিংবা মনের ভিতর ঢুকিয়া যায় না! একটা কিছু শক্তি, বৈদ্যুতিক স্রোত বা চুম্বকের আকর্ষণ-বিকর্ষণের মত

কিছু ইন্দ্রিয়ে ক্রিয়া করে, এই ত আমরা ধরিয়া লই। সব গুণের বেলায় এরূপ ধরিয়া লইতে আপত্তি কি? অসুবিধা একটু আছে। সাধারণতঃ আমরা বিশ্বাস করি যে বাহিরে কতকগুলি জড়পদার্থ আছে যাহা হইতে বৈদ্যুতিক প্রবাহের মত কিছু আসিয়া আমার কাণে শব্দ সৃষ্টি করে: এখানে জড় প্রকৃতি স্বীকৃত। যদি এই জড় প্রকৃতি অস্বীকার করি, তবে কোন গুণেরই ত উৎপত্তি-ভূমি রহিল না। বার্ক্‌লে (১৬৮৫-১৭৫৩) উত্তর দিলেন, ঈশ্বর রহিয়াছেন বলিলেই ত যথেষ্ট। তিনি ত সনাতন সক্রিয় এবং সর্বদা বিনিদ্র-নয়ন! তাঁহার লীলায়ই আমাদের সমস্ত অনুভূতি হয়, বলিতে দোষ কি? তড়িৎ-প্রবাহ বা চুম্বক প্রবাহ না মানিয়া ঈশ্বরের ক্রিয়া স্বীকার করায় আপত্তি কিছু থাকিতে পারে না; তাহাতেও একটা জগৎ পাওয়া যায়! কিন্তু এক ফুৎকারে চন্দ্র-সূর্য, বৃক্ষ-লতা, গিরি-নদী, গ্রাম-নগর সমস্ত লইয়া জড়জগৎ উবিয়া যায়! থাকে কেবল অনুভূতির ক্ষেত্র একটা মানস জগৎ!

এই সিদ্ধান্তের ফলে একটা জগৎ রহিল, কিন্তু জড় বলিয়া কিছু রহিল না। তথাপি মানুষের চারিদিকে জগৎ একটা রহিয়া গেল। এই জগতে শৃঙ্খলা আছে—নিয়ম আছে, কার্য-কারণ সম্বন্ধ আছে; পদার্থবিদ্যা এই জগৎ সম্বন্ধে যাহা নিশ্চিত করিয়া বলে, সে সব অসত্য নয়, অসত্য শুধু জড়। অধিকন্তু এই জগতের জ্ঞাতা হিসাবে মানবাত্মা আছে। জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় দুই-ই এই সিদ্ধান্ত অনুসারে সত্য; শুধু বৃক্ষ, কুঠার ইত্যাদি যে সব জড়ে সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে সে সমস্ত ভুল! আত্মা এবং জগৎ দুই-ই স্থির পদার্থ, সৎ পদার্থ, অসৎ নয়। এখানে একটা অসুবিধা আছে; জড় যদি না রহিল, তবে আমরা খাই কি? মানস খাদ্য? পরি কি? মানস-বস্ত্র? বাঁটি কোথায়? মানস-ভূমিতে? এই সব বলিয়া অনেকে

এই মতটাকে উপহাসও করিয়াছেন। তবে, উপহাস দর্শন সহ্য করিতে পারে; উহাতে সে বিচলিত হয় না।

কিন্তু এইখানেই কি সকল প্রশ্নের বিরতি হইল? স্থির পদার্থ, কার্য-কারণ সম্বন্ধ, স্থির আত্মা, আমরা জানি কি করিয়া? জ্ঞানের ত একমাত্র পন্থা ইন্দ্রিয়। কোন্ ইন্দ্রিয় কার্য ও কারণের সম্বন্ধের ন্যায় স্থির ও নিশ্চিত সম্বন্ধের জ্ঞান দেয়? কোন্ ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা আত্মাকে জানি? কোন উপায়েই নয়। অভ্যাসবশে এই রকম কতকগুলি বিশ্বাস আমাদের হইয়া যায়; পর পর অবিশ্রান্তভাবে অনেক অনুভূতিই আমাদের হইয়া যায়; কখনও রূপ, কখনও রস, কখনও উহাদের স্মৃতি—এই সবের একটা বিরামহীন প্রবাহ আমাদের অনুভবে আসে। অভ্যাস মত ইহাকে আমরা 'আমি' বা 'আত্মা' বলি। আমরা যাহাকে আত্মা বলি, তাহা একটি অনুভূতির সমষ্টি মাত্র—যেন বিবিধ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের একটি পুলিন্দা। স্থির এক আত্মা বলিয়া কিছু নাই। জগৎ সম্বন্ধেও এই এক কথা। অনুভূতির প্রবাহ সুষুপ্তিতে হয়ত ক্ষণিকভাবে রুদ্ধ হয়; না হইলে উহা ত চলিয়াছে; উহারই নাম দেই 'জগৎ;—অস্থির একটা প্রবাহ অথবা অনুভূতির একটা সম্ভাবনা মাত্র। কার্য কারণের সম্বন্ধকে যখন নিশ্চিত একটা সম্বন্ধ মনে করি, উহাও একটা অভ্যাস মাত্র; বার বার অভিজ্ঞতার ফলে জন্মে। স্কট্ল্যাণ্ডে হিউম্ (১৭১১-১৭৬৬) এই সিদ্ধান্ত করিলেন। ইহার ফল কি হইল? জ্ঞান রহিল কিন্তু জ্ঞেয় পদার্থ রহিল না। একটা দুরপনেয় অজ্ঞেয়তাবাদ দর্শনের সিংহাসন লাভ করিল। এই মতের প্রবল এবং প্রচুর প্রতিবাদও হইয়াছে। প্রতিবাদীরা বলিতেন, জীব-জগৎ সব অসিদ্ধ করিয়া দেওয়ায় বুদ্ধির কসরত দেখান যাইতে পারে; কিন্তু খুব বাহাদুরি নাই। সাধারণ মানুষের সরল বিশ্বাসকে একটা ঝাঁকানি দিলেই দর্শন হয় না। জগৎ যাহা আছে তাহাই

আমরা জানি, যেমন আছে, ঠিক তেমনই জানি। জগৎও আছে, আমরাও আছি এবং আমরা উহাকে জানিতেও পারি। কাপড়ে-কীটের মত জানিবার পদ্ধতিতে প্রবেশ করিয়া উহাকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া কোন লাভ নাই। সাধারণ মানুষের সরল বিশ্বাসে নির্ভর করা চলে।

এই প্রতিবাদ সত্ত্বেও কম্পমান জ্ঞানের সৌধ আবার সহজেই স্থিরত্ব লাভ করিতে পারিল না—অজ্ঞেয়ত্ববাদ একেবারে দূরীভূত হইল না।

আমরা যে দুই স্রোতের কথা আগে বলিয়াছি, তাহার একটি এইখানে আসিয়া পৌঁছিল—১৮ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে।

দ্বিতীয় স্রোতটী আরম্ভ হইয়াছিল—দ্য-কার্তের চিন্তায়। তাহাতে চিন্তা যে করে সেই আত্মাই সর্বপ্রথম স্বীকৃত হয়। সব অবিশ্বাস করিলেও, সমস্ত কিছু সন্দেহ করিলেও, যে সন্দেহ বা অবিশ্বাস করে সে থাকিয়া যায়। সুতরাং আমার অস্তিত্ব আমি আর সন্দেহ করিতে পারি না। তার পর দেখা যায়, আমি বাহির হইতে জ্ঞান পাই এবং আমার ভিতরেও নানা প্রকার ধারণা আছে; ইহাদের মধ্যে কতক অস্পষ্ট, কতক খুবই স্পষ্ট। ঈশ্বর সম্বন্ধে একটা ধারণা আছে, খুবই স্পষ্ট—সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান; সত্যময়! কোথায় পাইলাম? কোন ইন্দ্রিয় এই জ্ঞান দিতে পারে না; অথচ, ইহাকে অবিশ্বাসও করা চলে না। সুতরাং ঈশ্বর আছেন! জগৎ সম্বন্ধেও একটা ধারণা আছে; ইহাও কোন এক ইন্দ্রিয় দিতে পারে না; সুতরাং ইহা সত্যময় ঈশ্বরেরই দান; এবং ঠিক সেই জন্যই ইহাও বিশ্বাস করিতে হয়।

জীব, জগৎ ও ঈশ্বর—তিনই এই সিদ্ধান্ত অনুসারে সত্য। কিন্তু জীব ও জগতের মধ্যে সমান-ধর্ম কিছুই নাই; জীব চেতন চিন্তা-শক্তি-সম্পন্ন, অণু, ও সূক্ষ্ম; আর জগৎ জড় ও অচেতন, অনুভূতিহীন, বিস্তৃতিমান্—জায়গা জুড়িয়া পড়িয়া আছে। সুতরাং জড় জগৎ ও চেতন

জীবের মধ্যে সাধারণ গুণ কিছু নাই। অথচ উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক দেখা যায়। আকাশে জড় চাঁদ উঠিলে চেতন আমি তাহা দেখিতে পাই; জড় নদীর কল কল শব্দ চেতন আমি অনুভব করি; এই রকম ত সর্বদাই ঘটিতেছে। বাহ্য জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ ত আমাদের রহিয়াছে! শুধু বাহিরের জগৎ আমাদের উপর ক্রিয়া করে, এমন নয়; আমরাও বাহিরের জগতে কাজ করি; দেহে এবং দেহের সাহায্যে বৃহত্তর জগতে কিছু কাজ ত করি! রাস্তাটা হাঁটিয়া যাই—গাড়ীটা চালাই—গাছটা কাটিয়া ফেলি, কাগজটুকু ছিঁড়িয়া ফেলি, কাগজের উপর কালির দাগ দিয়া চলি, ইত্যাদি, সুতরাং জড় ও জীবের সম্বন্ধ যে রহিয়াছে তাহা স্পষ্ট! কিন্তু কি প্রকারে উহা সম্ভব হয়? ইন্দ্রিয়ে আস্থাবান্ যাঁহারা, তাঁহারা বলিবেন, জড়ের শক্তি—আলোক কিংবা বাতাসের ঢেউ—আমার ইন্দ্রিয়ে একটা ক্রিয়া করে—সেই ক্রিয়ার ফলে মনে অনুভূতি উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয়ের উপর জড়ের ক্রিয়া স্বীকার করার কোন অসুবিধা নাই; কেন না ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয় সহিত সমগ্র দেহ জড় জগতেরই অন্তর্গত এবং জড়ের নিয়মে শাসিত। কিন্তু মন ত পৃথক্ জিনিস। একটা কথা আছে, সমান সমানের উপর ক্রিয়া করিতে পারে। মন আর বাহ্য জগৎ ত সমানধর্মা নয়; সুতরাং উভয়ের মধ্যে একে অন্যের উপর ক্রিয়া করে কিরূপে?

উত্তর হইল, দুইটা ঘড়ি একসঙ্গে এক সমানে চালাইয়া দিলে তাহারা পৃথক্ থাকিয়াও একই সঙ্গে একটা দুইটা বাজিয়া যাইবে, একই রকম সময় দিবে; এমন ত ঘটে। মনে করিতে দোষ কি যে জগৎ একটা যন্ত্র, ঘড়িরই মত; চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে; পর পর ঘটনা ঘটিয়া যাইতেছে। শুধু শীতের পর গ্রীষ্ম—এই রকম বড় বড় ঘটনা নয়; এই শব্দ, এই আলো, এই রস এই গন্ধ—এই রকম সহস্রধা ক্ষুদ্রবৃহৎ ঘটনা ঘটিয়া যাইতেছে। আর একটা প্রবাহ মন; সেখানেও বেদনার পর অনুভূতি, অনুভূতির

পর বেদনা, রূপের পর রস ও স্পর্শ—প্রভৃতি অনন্ত ঘটনা পর পর ঘটিয়া যাইতেছে। জীব ও জগৎ দুইটি মিলান ঘড়ির মত ; সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কিছুই নাই—কেন না, তাহা অসমানধর্মার মধ্যে অসম্ভব ; কিন্তু উভয়ে মিল রাখিয়া চলিতেছে !

কে এই মহা মিলন ঘটাইয়া দিল ? উত্তর সহজ ; ঈশ্বর ত স্বীকৃত ও প্রমাণিত ; তিনিই এই ভাবে জীবের ও জগতের মধ্যে এই সমান্তরাল গতি প্রবর্তিত করিয়া দিয়াছেন।

একটী চিরস্থায়ী জীব—সর্বদা সক্রিয় আর একটী চিরস্থায়ী জগৎ যদি হইত, তবে এই প্রকার সমান্তরাল গতি কল্পনায় কোন অসুবিধা হয় ত থাকিত না। কিন্তু জীব আসে ও যায় ; আর সব সময় ক্রিয়াও করে না, অনুভবও করে না। চুপ করিয়া বসিয়া আছি ; কোন কারণে ইচ্ছা হইল, বইখানা সরাইয়া রাখি। অমনি বাহ্য জগতে ক্রিয়া আরম্ভ হইল ; হাত নড়িল, বই সরিল, ইত্যাদি ; কিন্তু ইহাকে একটা অবিরাম প্রবাহের অন্তর্ভুক্ত করা একটু কঠিন। তাহা অপেক্ষা ঈশ্বর ঘড়ি মিলাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন না ভাবিয়া সর্বদাই কাজ করিতেছেন, ভাবিতে দোষ কি ? তাঁহার ত ঘুমও নাই, বিশ্রামও নাই ! আমার মনে ইচ্ছা হওয়া মাত্রই ত তিনি টের পাইলেন ; অমনই আমার হাতের মাংস পেশীকে সক্রিয় করিয়া দিলেন ; পরপর ঘটনা ঘটিয়া বইখানা সরিয়া অন্যত্র গেল। আবার, তাঁহারই জগতের আলোকরশ্মি আমার চোখে পড়িল ; তিনি ত টের পাইলেন ; অমনই আমার একটা ফুল দেখা হইল। এইভাবে ঈশ্বরকে সর্বদা কাজে খাটাইলে জীব ও জগতের সম্বন্ধের মধ্যে আর কোন গোল থাকে না।

এই চিন্তাধারার মধ্যে তিনটী সত্য স্বীকৃত ; জীব, জগৎ ও ঈশ্বর। ইহার মধ্যে ঈশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ, স্বাধীন, স্বতন্ত্র, অকারণ কারণ, স্রষ্টা-হীন স্রষ্টা ;

অর্থাৎ তাঁহার আর কোন কারণও নাই, স্রষ্টাও নাই। জীব ও জগৎ কিন্তু তাহা নয়; ইহারা সত্য কিন্তু অস্বতন্ত্র, ঈশ্বরের অধীন সত্য। আমাদের জ্ঞানের ব্যাখ্যায় যত গোল দেখা গিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ এই দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ অথচ অ-স্বতন্ত্র সত্য স্বীকার। জীব ও জগৎ, চেতন ও জড়, এই দুইয়ের মধ্যে কোন সমান গুণ নাই অথচ ইহারা সত্য এবং ইহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধও রহিয়াছে। এই অস্বতন্ত্র সত্য দুইটীকে অস্বীকার করিলে দোষ কি? কি ভাবে তাহা করা যায়? একটা মাত্র সত্তা স্বীকার করা যায় না? তাহার নাম লইয়া কলহ করা বৃথা। তাহাকে ঈশ্বরও বলা যায়—ব্রহ্মও বলা যায়—অন্য কোন নাম দিলেও দার্শনিকের আপত্তি হওয়া উচিত নয়। তবে সেটী স্বয়ম্ভু, স্বয়ংসিদ্ধ এবং স্বতন্ত্র সত্তা, ইহা ভাবিতে হইবে; আর ভাবিতে হইবে যে, যাহাকে জড় বলি এবং যাহাকে চেতন বলি, তাহা উহারই গুণ মাত্র, পৃথক্ দ্রব্য নয়। সেই পরম সত্যের অনেক, অসংখ্য গুণ হয়ত আছে; কিন্তু আমরা দুইটীর সঙ্গেই পরিচিত—জড়ত্ব ও চেতনত্ব। অর্থাৎ জগৎ এই পরমার্থিক সত্তার গুণ বিশেষ। ভিন্ন ভিন্ন আকার আর জড় জগতের ভিন্ন ভিন্ন বস্তু, তাহার জড়ত্ব গুণের বিভিন্ন প্রকার মাত্র। জীব ও জগতের ব্যাখ্যা হইয়া গেল; আর, একই দ্রব্যের গুণ বলিয়া তাহাদের উভয়ের সম্বন্ধও আর দুর্বোধ্য রহিল না। ফুলের গন্ধ আর রং ত এক সঙ্গে থাকে, তেমনই জড় ও চেতন একই সনাতন পরমার্থিক সত্তার অনন্ত গুণের মধ্যে দুইটী অসীম গুণ ভাবিলে জীব ও জগৎ বুঝিতে আর কোন অসুবিধা থাকে না। ১৭শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইউরোপের চিন্তার এক স্রোত এইখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

এই পর্যন্ত যে দুইটী চিন্তা স্রোতের পরিচয় আমরা লাভ করিলাম তাহাদের শেষ ফল কি হইল? একদিকের সিদ্ধান্ত একটা দুরন্ত অজ্ঞেয়তা-

বাদ—জগৎ অজ্ঞেয়, এমন কি জ্ঞাতা জীবও একটা অনুভূতির প্রবাহ মাত্র। আর একদিকে জীব ও জগৎ ঈশ্বরের বিশেষণ মাত্র; জীব ও জগতে দৃষ্ট নানাত্ব এই বিশেষণ দুইটীর অচিরন্তন প্রকার মাত্র। শুধু ঈশ্বর সনাতন ও একমাত্র সত্তা।

১৮শ শতাব্দীতে জার্মনীতে কাণ্টের ( ১৭১৪-১৮০৪ ) দর্শনে এই উভয় স্রোতের মিলন ঘটিয়া যায়।

## ৮। আলোক-ধারা

আর অগ্রসর হওয়ার আগে এইখানে আমাদের অন্য একটা কথা মনে করিতে হইবে। আমরা এ পর্যন্ত ১৭শ—১৮শ শতাব্দীর কথা ভাবিয়াছি। এই যুগটীকে ইউরোপের ইতিহাসে আলোকধারার যুগ বলা হয়। এই সময়টার ভিতর ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, ইটালীতে ও জার্মনীতে নূতন বিজ্ঞান প্রবলবেগে মানুষের মন অধিকার করিয়া ফেলে; প্রাচীন বিশ্বাস ও প্রাচীন মতের উপর নূতন আলোকপাত হয়; নূতন সত্যের আবিষ্কারের ফলে নূতন মত উদ্ভূত হয়। নানা দিক্ দিয়া মানুষ নূতন আলোকের সন্ধান পায়। জ্যোতিষে ও পদার্থবিদ্যায় কপর্নিকস্, কেপ্‌লার, গেলিলিও প্রভৃতির মত গৃহীত ও প্রচারিত হইয়াছিল এবং নিউটনের যুগ চলিতেছিল। ফরাসী দেশে ভলতেয়ার ( ১৬৯৪-১৭৭৮ ), রুশো ( ১৭১২-১৭৭৮ ), দিদিরো ( ১৭১৩-১৭৮৪ ) প্রভৃতি সাহিত্যিক ও ভাবুকদের আবির্ভাবও এই সময়েই ঘটে। সুতরাং এই এক শ'-দেড়শ' বছর ধরিয়া ইউরোপের মনে যে নূতন নূতন ভাবের ও চিন্তার আবির্ভাব হইতেছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের এই নূতন আলোক হইতে দর্শনও বঞ্চিত হয় নাই। এই সময়টায় বিশেষভাবে বিবেচিত হইয়াছে ব্যক্তির কথা, সমাজের কথা, রাষ্ট্রের কথা, মানুষের চারিত্র-নীতি ও তাহার অধিকার এবং সভ্যতা; এ সকল সাহিত্য ও দর্শনে সমানভাবে আলোচিত হইয়াছে;

তাহার সঙ্গে জ্ঞানের কথা, ধর্মের কথা, ঈশ্বরের কথাও উঠিয়াছে। এ সকলের ভিতর রাষ্ট্রের কথা—রাজা ও প্রজার অধিকারের কথাই মাথা উঁচু করে বেশী এবং গীর্জা ও পাদ্রীদের কথাও বাদ পড়ে নাই।

এই ১৮শ শতাব্দীর শেষ দিক্ দিয়াই ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হয়; তাহার কিছু পূর্বে আমেরিকাও ইংরেজের শাসন-রশ্মি ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হইয়া যায়। সেটাও একটা বড় ঘটনা; এখানে আমাদের আলোচনায় তাহার কথা খুব প্রয়োজনীয় নয় বটে, কিন্তু জগতের ইতিহাসে উহা নগণ্য ঘটনা নয়। এই সময়ে আরও একটা বড় ঘটনা আরম্ভ হয়; সেটা ক্রীতদাসদের স্বাধীনতা দেওয়ার চেষ্টা। আফ্রিকার নিগ্রোদিগকে পশুপক্ষীর মত ধরিয়া লইয়া এক শ্রেণীর লোক বিক্রয় করিত—বিশেষত আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের দক্ষিণ অংশে। ইহাদের প্রতি ব্যবহারও করা হইত পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট। ইংলণ্ডে কথাটা প্রথম উঠে—মানুষকে মানুষ বিত্তের মত ব্যবহার করিতে পারে কি না। ইংলণ্ডের আদালত এই প্রকার স্বামিত্বের বিরুদ্ধে রায় দেয়। তাহার পর হইতেই এইরূপ দান ও ক্রয়বিক্রয় একেবারে সর্বত্র নিষিদ্ধ করিবার জন্য জোর চেষ্টা চলিতে থাকে। ১৮শ শতাব্দীর শেষ হইতে আরম্ভ হইয়া ১৯শ শতাব্দীর মাঝামাঝি আসিয়া উহা পরিপূর্ণভাবে কৃতকার্য হয়। ইহা দ্বারাও নানা জাতির চিত্ত উদ্বেলিত হয় এবং নূতন ধারণারও উদ্ভব হয়। ফরাসীদেশে রাজার মাথার মুকুট মাটীতে গড়াগড়ি যায়, পাষাণ-কারা ভেদ করিয়া সব রাজবন্দীরা মুক্তি পায়; রাজার প্রহরী রাজাকে রক্ষা করিতে অসম্মত হয়; আরও কত পরিবর্তন সেই সময়ে হয়; সে সব সাধারণ ইতিহাসের বক্তব্য, আমাদের নয়। কিন্তু এই সমস্তের পশ্চাতে ভলতেয়ার, রুশো প্রভৃতি যে সব লেখকের লেখা ও চিন্তা ইন্ধনের কাজ করিতেছিল, তাঁহাদিগকে আমরা আলোকের যুগের দার্শনিক বলিয়া জানি। নেপোলিয়নের একটা কথা

আছে যে, ফরাসী দেশের বুর্‌বোঁ রাজবংশ যদি মসী-লেখনীর ব্যবহার সংযত করিতে পারিত তবে হয়ত তাহাদের সিংহাসনও রক্ষা পাইত। ইহা ঠিক যে, এই সময়ে অনেক বিপ্লবী চিন্তা লেখনীর সাহায্যে চারিদিকে ধ্বংসের বীজ বপন করিয়া যাইতেছিল। লেখনীকে যে তরবারি অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী বলা হয়, এই যুগের সাক্ষ্যই তাহার প্রধান যুক্তি ও প্রমাণ।

স্তম্ভের ভিতর হইতে নরসিংহের মত এই বিপ্লবের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসেন নেপোলিয়ন। এই নেপোলিয়ন ইউরোপে কি করিয়াছিলেন—১৮১৫ খ্রীঃ অঃ পর্যন্ত ইউরোপে কি পরিমাণ রক্তপাত হইয়াছিল, তাহা আমাদের বর্ণনীয় নয়। এই নেপোলিয়নের বিজয়ী সেনা জার্মান জাতিকেও নিপীড়িত করে; দার্শনিক হেগেলের জানালা ভেদ করিয়া ফরাসী সেনার গুলি ঢুকিয়াছিল; তাঁহার গৃহ আক্রান্ত হইয়াছিল; একখানা বইয়ের পাণ্ডুলিপি বগলে করিয়া হেগেল গৃহত্যাগ করিয়া প্রাণরক্ষা করেন; এ সব ইতিহাসের কথা। * কিন্তু জার্মানরা শক্তিমান্ জাতি। রাজনীতিতে পরাজিত—এমন কি পদদলিত হইলেও—ঠিক এই সময়েই অর্থাৎ ১৭৮০ হইতে ১৮২০ খ্রীঃ অব্দের মধ্য চিন্তা জগতে,—সাহিত্যে ও দর্শনে—জার্মান জাতির দান জগতের ইতিহাসে অতুলনীয়। জার্মান কবি গেটেরও ইহাই আবির্ভাব কাল। এই সময়ের প্রথম, প্রধান এবং গুরুস্থানীয় দার্শনিক কাণ্ট পর্যন্ত আমরা পৌঁছিয়াছি।

## ৯। দর্শনের যুক্ত ত্রিবেণী ; কাণ্ট

দর্শনের এক ধারার প্রবাহ আমরা ইংলণ্ডে ও স্কটল্যাণ্ডে দেখিয়াছি; তাহার শেষ সিদ্ধান্তে জ্ঞান আছে, কিন্তু জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা নাই—আর জ্ঞানও একটা প্রবাহ মাত্র, স্থির নিশ্চিত কিছু নয়। আর এক ধারা

* The Story of Philosophy—Will Durant

ফরাসী দেশে আরম্ভ হইয়া যে শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছে, তাহাতে জীব ও জগৎ—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এক অনাদি, অনন্ত, অচিন্ত্যগুণ পরমার্থিক সত্তার বিশেষণ মাত্র হইয়া দাঁড়ায়। এই দুইটী ধারার সঙ্গে যোগ করিতে হইবে ফরাসী বিপ্লবের আগে সে দেশের সাহিত্য ও দর্শন—ভল্‌তেয়ার, রুশো প্রভৃতির চিন্তা। এই তৃতীয় ধারাতে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার কথার চেয়ে বেশী আলোচিত হইয়াছে মানুষের কথা—তাহার সমাজ ও রাষ্ট্রের কথা, তাহার অধিকার অনধিকারের কথা। এই তিন ধারার যুক্ত ত্রিবেণী সৃষ্টি হয় ইম্যানুয়েল কাণ্টের দর্শনে। কাণ্ট জার্মান পণ্ডিত। তাঁহার প্রধান গ্রন্থ—'শুদ্ধ চিন্তার বিচারণা' (১), প্রকাশিত হয় ১৭৮১ খ্রীঃ অব্দে। ইউরোপের গত চার শ' বছরের দর্শনের ইতিহাসে ইহা একটী স্মরণীয় ঘটনা।

জগতের দর্শনের ইতিহাসে কাণ্টের স্থান এত বড় যে, তাঁহার সম্বন্ধে যত কম কথা বলা যায়, ততই নিরাপদ্; কারণ তাহা হইলে তাঁহার চিন্তার মূল্যবান্ বিশিষ্ট একটা দিক্ বাদ দেওয়া হইয়াছে, এ কথা কেহ বলিতে পারিবে না; অনেক দিক্‌ই ত বাদ পড়িবে। কাণ্টের নিজের সম্বন্ধে দুইটী উক্তি প্রসিদ্ধ এবং দুইটীই ইতিহাসে তাঁহার স্থান সংক্ষেপে প্রকাশ করে। একটা কথা এই যে, তিনি সর্ববিশ্বাসী ঘুমন্ত (২) জগৎকে জাগ্রত করিয়াছিলেন; আর একটী এই যে, জ্যোতিষে ও পদার্থবিদ্যায় কপার্নিকসের যে স্থান, দর্শনে তাঁহারও সেই স্থান! প্রথমত, মানুষ বিনা বিচারে অনেক কিছু বিশ্বাস করে—হয় ধর্মের শিক্ষায়, নয়ত সমাজের শিক্ষায়; ইহা একপ্রকার ঘুম—বিচারশক্তির ঘুম। কাণ্ট এই ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিয়া সব কিছুই বিচার করিয়া বিশ্বাস করিতে উপদেশ দেন। দ্বিতীয়ত,

(১) "Critique of Pure Reason." (২) "dogmatic slumber"

কপর্নিকস্ ইউরোপকে শুনান যে পৃথিবী জগতের কেন্দ্র নয়, সূর্যাদি আকাশের জ্যোতিষ্ক মণ্ডল তাহার চারিদিকে ঘুরে না; পৃথিবী নিজে ঘুরে—অন্যান্য অনেকের সঙ্গে সূর্যের চারিদিকে। পৃথিবীর কেন্দ্রত্ব দূর হয় আর সূর্যের কেন্দ্রত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কাণ্টের আগে দর্শনে জড়জগৎ, না হয় ঈশ্বর লইয়া মানুষ বিচার আরম্ভ করিত; নিজের বিচারশক্তির উপর অগাধ বিশ্বাস লইয়া সে অগ্রসর হইত; কিন্তু সেই বিচারশক্তির ওজন ও বিচার করিত না! কাণ্টের মতে মানুষের সকল বিচারের কেন্দ্র সে নিজে; নিজকে বুঝিয়া—নিজের জানিবার শক্তির পরিমাপ করিয়া—পরে দর্শনের অন্য প্রশ্নের বিচারে অগ্রসর হইতে হইবে। কপর্নিকস্ যেমন বিশ্বের কেন্দ্র বদলাইয়া দেন, কাণ্টও তেমনই দার্শনিক চিন্তার কেন্দ্র পরিবর্তিত করিয়া দেন।

পূর্বের আলোচনার একটু পুনরুক্তি হইলেও কাণ্টে দর্শনের ত্রিবেণী-সঙ্গমের কথাটা আর একটু স্পষ্ট করা দরকার। আধুনিক দর্শনের আরম্ভে আমরা পাইয়াছি, মানুষের নিজের বিচারশক্তির উপর অগাধ বিশ্বাস। শাস্ত্র না হইলেও চলে, শব্দ প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন; ইন্দ্রিয়গুলির যথাযথ ব্যবহার করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া, চিন্তা ও বিচার করিয়া মানুষ সবই জানিতে পারে। এইভাবে স্বাধীন বিচারের একটা রীতিমত অর্চনা আরম্ভ হয়। ফরাসী বিদ্রোহের সময় একটী নারীকে স্বাধীন চিন্তার দেবী-বিগ্রহ কল্পনা করিয়া উন্মুক্ত স্থানে অর্চনা পর্যন্ত করা হইয়াছিল। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে বিচার দ্বারা জানিবার শক্তির উপর মানুষের আস্থা কত বাড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু জ্ঞানশক্তির উপর এই আস্থা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দর্শনে ফল দিয়াছিল দুই রকম; একদিকে হিউমের অজ্ঞেয়তা বাদ; যাহাতে জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, জগৎ ও জীব বলিয়া স্থায়ী পদার্থ কিছু থাকে নাই, ছিল শুধু জ্ঞানের প্রবাহ বা পুলিন্দা। আর এক দিকে

ফল হয়, জীব ও জগৎ দ্বারা বিশেষিত একমাত্র ঈশ্বরই সত্তা ( Spinoza )। কিন্তু ফল এক না হইলেও এচ উভয়ত্রই আরম্ভে গৃহীত মানুষের নিজের বিচার শক্তিতে আস্থা সমানভাবেই ছিল। বিদ্রোহের দিকে গন্তুকাম ফরাসী দেশে এই বিচারে আস্থা ক্রমশ প্রবল হইয়া এতদূর অগ্রসর হয় যে, রাজা, রাষ্ট্র, ধর্ম, ধর্মযাজক, সমাজ ও শ্রেণীভেদ, এমন কি, ঈশ্বর পর্যন্ত অবিশ্বাস্যের পর্যায়ে পড়েন। বাংলার হিন্দুর ভাষায়, এক কথায়, দেব-দ্বিজে ভক্তি তখন একেবারে উবিয়া যায়। বিচারের ফলে বিচারিত সমস্তই অবিশ্বসিত হইয়া যায়; থাকে শুধু বিচার ও বিচারে বিশ্বাস। এই অবিশ্বাসী বিচারের বিরুদ্ধে আসে রুশোর বিশ্বাসী অন্তর্বেদনা। মানুষের মর্ম আছে—অনুভূতি আছে, তাহা কি মিথ্যা? শুধু বিচারই সত্য? বিশ্বাসী বিচার, অবিশ্বাসী বিচার এবং বিশ্বাসী অন্তর্বেদনা—এই তিনটী ধারা কাণ্টে সম্মিলিত হয়। স্কটল্যাণ্ডের হিউম ও ফরাসী দেশের রুশো বিশেষভাবে কাণ্টের চিন্তাকে গড়িয়া তুলেন, একথা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। সঙ্গে বিশ্বাসী বিচারশক্তির উপাসকদেরও ( Spinoza ইত্যাদির ) প্রভাব থাকে। এইভাবে কাণ্টে আসিয়া তিনটী স্পষ্ট চিন্তা-স্রোতের মিলন দেখিতে পাই।

কাণ্টের দর্শনের উপর ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনেক বই হইয়াছে; এদেশে আমরা সাধারণত ইংরেজীর সাহায্যেই তাঁহার আলোচনা করি। তাঁহার লিখিত ভাষা ( জার্মন ) দুর্বোধ্য, একথা স্বীকৃত; কিন্তু সরল ভাষ্য টীকার সংখ্যাও প্রচুর রহিয়াছে; এবং সেই জন্যই তাঁহার অভিমত কি, তাহা লইয়া মতভেদও মন্দ হয় নাই। আমাদের পক্ষে এখানে সংক্ষেপে কয়েকটী কথা মাত্র বলা দরকার। তাঁহার নিজের একটী উক্তি আছে, "মানুষের চিন্তাই বাহ্য প্রকৃতি সৃষ্টি করে (১)"; এইটীকে প্রধান সূত্র

---

( ১ ) "Understanding maketh Nature."

ধরিয়া আমরা অগ্রসর হইতে পারি। বাহ্য প্রকৃতিকে আমরা কি ভাবে ভাবি? নিয়মের অধীন, সুসমঞ্জস ও সুশৃঙ্খল; কোন প্রকার খামখেয়ালী নাই; সনাতন অলঙ্ঘ্য নিয়ম ইহার প্রত্যেকটী ব্যাপার শাসন করিতেছে। সূর্যের উদয়-অস্ত, মাস ঋতু, উদ্ভিদ্ ও প্রাণী-জগতে জন্ম-মৃত্যু, ইত্যাদি সমস্তই নিয়ম-শাসিত। এই সব নিয়মের চর্চা বিজ্ঞান করে; আলো ও শব্দের গতি, চুম্বকের আকর্ষণ ইত্যাদি সমস্ত নিয়ম একটীর পর একটী বিজ্ঞান জানিয়াছে, কাণ্টের সময়ও জানিতেছিল এবং এখনও জানিতেছে। এইভাবে বিজ্ঞান যে নিয়ম-শাসিত বাহ্য প্রকৃতিকে—পঞ্চভৌতিক জগৎকে—আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে, তাহা আমরা জানি কি প্রকারে? নিশ্চয়ই ইন্দ্রিয় দ্বারা নয়; সুতরাং ইংলণ্ডের ও ফ্রান্সের কোন কোন দার্শনিক যে ইন্দ্রিয়কেই জ্ঞানের একমাত্র মূল মনে করিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করিতে হয়। প্রকৃতির নিয়মকানুন ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না; চিন্তা করিয়া বুঝিতে হয়। সুতরাং নিয়মময় প্রকৃতি মানুষের বুদ্ধির সৃষ্টি।

তবে কি মনের বাহিরে কিছু নাই? আছে, কিন্তু উহা যে আছে এই পর্যন্তই আমরা জানি; তাহার অথবা তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ জানিবার কোন উপায় আমাদের নাই। বাহিরের সেই বস্তু—একও হইতে পারে, বহুও হইতে পারে; সেই বস্তু বা বস্তুসকল আসল যে প্রকারের তাহা জানিবার শক্তি মনের নাই। কেন? রঙ্গীন কাঁচের ভিতর দিয়া দেখিলে সব জিনিসই রঙ্গীন দেখাইবে; যাহার চোখে এই কাঁচ চিরকালের জন্য লাগান আছে, সে চিরকালই সমস্ত জিনিস ঐ রঙে রঞ্জিত দেখিবে। তেমনই, মানুষের মনের গঠন এমনই যে, সব বস্তুই কতকগুলি রঙ্গীন ছিদ্র পথে সে দেখে। আমরা কাব্যের ভাষা ব্যবহার করিতেছি; কিন্তু উপায় নাই; তবে এই ছিদ্রপথগুলির দৃষ্টান্ত দিলেই আর ব্যাপারটা তত দুর্বোধ্য থাকিবে না।

আমরা যাহা কিছু জানি, দেখি বা শুনি—তাহা কোন এক সময়ে এবং কোন এক স্থানে জানি, ঐখানে এইমাত্র একটা শব্দ শুনিলাম; এখানে কাল একটা হাতী দেখিয়াছিলাম; ইত্যাদি। এইভাবে ইন্দ্রিয়ের সমস্ত জ্ঞান আমরা দেশে ও কালে বসাইয়া লই। এই দেশ ও কাল কিন্তু কোন ইন্দ্রিয়ই জানাইতে পারে না; কারণ, অনুভূতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ত দেশ ও কাল আসিয়া পড়ে। সুতরাং এই দুইটী মনেতে আগে হইতেই আছে; ঘরের জানালা দরজার মত, এই দুইটী মনের গঠনের অন্তর্গত। এই রকম কার্য কারণ সম্পর্ক প্রভৃতি আরও কতকগুলি রীতি আছে যাহার ভিতর দিয়া মন বাহ্য প্রকৃতিকে জানে। ঘরের যেমন নানা দিকে নানা রঙের কাঁচের জানালা থাকিতে পারে, মনেরও তেমনই এই সকল দরজা জানালা রহিয়াছে; ইহাদিগ হইতে মন কখনও মুক্ত হইতে পারে না; সুতরাং যাহা কিছু আমরা দেখি, শুনি, চিন্তা করি, সব কিছুতেই এই জানালার কাঁচের রং লাগিয়া যায়। বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জানিবার শক্তি আমাদের নাই।

কিন্তু জ্ঞান আমাদের হয়; এই জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত হয়; ক্রমশ উচ্চ হইতে উচ্চতর বিজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। মানুষ জানিয়া চলিয়াছে; যাহা সৎ তাহাকে ঠিক নয়—তাহাকে নানারকম রঙে চুবাইয়া লইয়া জানিতেছে। এইভাবে কাণ্ট জীব ও জগৎ—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়কেই রক্ষা করিয়াছেন; উভয়ের সম্পর্কও প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সত্যকার জগৎ অজ্ঞাত থাকিলেও মানুষের জ্ঞানের ও কাজের জন্য জগৎ একটা রহিয়াছে; তাহার উপাদান আসে মনের বাহির হইতে—আর, তাহাকে নানা ছাঁচে আকার দিয়া লয় জ্ঞাতা মন। এই ছাঁচগুলির সংখ্যা তর্ক শাস্ত্রের সাহায্যে জানিয়া লওয়া যায়; যথা, এক, বহু, সমস্ত; আছে, নাই, হইতে পারে; ইত্যাদি নানা ভাবে আমরা বস্তুর বিচার করি; এই গুলিই

জ্ঞানের ছাঁচ; রঙ্গীন কাঁচের মত এই গুলির ভিতর দিয়াই বাহ্য জগৎ আমাদের জ্ঞানে প্রবেশ করে।

জীব ও জগৎ রহিল বটে, কিন্তু মানুষের জ্ঞান শক্তির একটা স্পষ্ট সীমাও নির্দিষ্ট হইয়া গেল। শুধু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান হয় না; শুধু চিন্তার সাহায্যেও নয়; দেখিবার কিছু না থাকিলে দেখা যায় না; রঙ্গীন কাঁচের দেখাও বাস্তবকে দেখা নয়। বাহিরে জগৎ আছে—ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাহা জানি; কিন্তু মনে ঢুকিবার পথেই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান কাঁচের রঙে রঞ্জিত হইয়া যায়। ইন্দ্রিয় এবং চিন্তাশক্তি উভয়ের সাহায্যে জ্ঞান হয়; বাস্তবের জ্ঞান হয়; কিন্তু উহা যেরূপ ঠিক সেরূপটা জানা হয় না।

কিছুকাল আগে (লকের সময়) একটা কথা উঠিয়াছিল যে, মানুষের জ্ঞানে এমন কিছুই নাই যাহা পূর্বে ইন্দ্রিয়ে ছিল না; ইহার উত্তরে পরে বলা হইয়াছিল (Leibnitz) যে, বুদ্ধিটা ছাড়া আর সব বাহিরিন্দ্রিয়ে দেওয়া এই উভয় মত মিলিত করিয়া কাণ্ট জ্ঞানোৎপাদনে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির কাহার কতটুকু দান তাহা স্পষ্ট করিয়া দিলেন। কিন্তু জ্ঞানের একটা স্পষ্ট সীমারেখা টানা হইয়া গেল। ইন্দ্রিয়-পথ না হইয়া ত কোন জ্ঞান হইতে পারে না! আবার ঐ পথে আসিবার সময় উহার উপর আবার ডাকের চিঠির মত কতকগুলি ছাপ পড়িয়া যাইবে! প্রশ্ন উঠিবে, ঈশ্বর, আত্মা ইত্যাদি? ইহারা ত আর ইন্দ্রিয়ের পথে মনে প্রবেশ করিতে পারে না? তবে কি ঈশ্বর নাই? আত্মা নাই? আমাদের কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে ধারণা আছে।

সাধারণ জ্ঞানের পথে ইহাদিগকে জানা সম্ভব নয়, ইহা কাণ্ট স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু ধারণাগুলি মনে আছে; তাহাদিগকে রাবিশের স্তূপেও ফেলিয়া দেওয়া যায় না। এইখানে আমরা কাণ্টের আর একটী প্রসিদ্ধ উক্তি উদ্ধৃত করিব; তিনি বলিতেন, "এই বিশ্বে মাথার উপর অনন্ত নক্ষত্ররাজি-খচিত আকাশ আর মনের ভিতর কর্তব্য জ্ঞানের

কড়া আদেশ আমাকে যেমন অভিভূত করে তেমন আর কিছুই নয়!" এই ভাবে নীতির আদেশ তিনি মানিয়া লন। তাহা হইতেই বাস্তব-জীবনের বিধি-নিষেধ সব আসে; এবং সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় ঈশ্বরে এবং আত্মায় ও আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসের ভিত্তি। জ্ঞানের পথে যাহাদিগকে পাওয়া যায় নাই, বিশ্বাসের পথে তাহাদের পুনঃপ্রাপ্তি কাণ্টের পক্ষে কি করিয়া সম্ভব হইল, সে কাহিনী এখানে বিবৃত করিতে গেলে আমাদের বিবরণ দীর্ঘ হইয়া যাইবে এবং কাণ্টের ভাষার ও যুক্তির কাঠিন্যও কতকটা আমাদিগকে পাইয়া বসিবে। সিদ্ধান্তটাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। অবিনশ্বর আত্মা এবং ঈশ্বর দুই-ই কাণ্টের ছিল; কিন্তু জ্ঞানের পথে তাহাদিগকে পাওয়া সম্ভব ছিল না; যে জ্ঞান হইতে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় নিয়মশাসিত বাহ্য জগৎ উদ্ভূত হয়, সেই পথে আত্মা ও ঈশ্বরকে জানা যায় না।

ধর্ম ও রাষ্ট্র সম্বন্ধেও কাণ্ট ভাবিয়াছিলেন এবং লিখিয়াছিলেন। ৭০ বৎসর বয়সে ধর্ম সম্বন্ধে একখানা বই লিখিয়া তিনি রাজার ধমক খাইয়া চুপ করিয়া গিয়াছিলেন। ৭৯ বৎসর বয়সে (১৮০৪ অব্দে) তাঁহার মৃত্যু হয়।

কাণ্টের চিন্তার প্রভাব এত দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে তাহা আজ প্রায় দেড় শ' বছর পরে আমরা এখনও অতিক্রম করিতে পারি না। গত শতাব্দীর দর্শন অর্থই কোন না কোন রকমে কাণ্টের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মানুষ হিসাবে এই লোকটীকে জানিতে কুতূহল হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

উত্তর জার্মনীতে কোনিক্‌স্‌বর্গ (Konigsberg) নামক একটী ছোট সহরে কাণ্টের জন্ম হয়। সেখানে একটী বিশ্ববিদ্যালয়ও ছিল। সেইখানেই তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা, বিদ্যাদান এবং জীবনাবসান ঘটে। ইনি ভূগোল,

জ্যোতির্বিদ্যা, নৃতত্ত্ব প্রভৃতিও আলোচনা করিয়াছেন—বই লিখিয়াছেন, কিন্তু দেশ ভ্রমণ করেন নাই। প্রায় ৮০টী বছর একটী জায়গায় কাটাইয়া যান। আকারে খর্ব,—৫ ফিটের বেশী নয়; অকৃতদার, একটি চাকর লইয়া সংসার করিতেন। এই চাকরটীর নামও ( ল্যাম্ফ্ ) ইতিহাস রক্ষা করিয়াছে। ইহা মহাপুরুষের সেবার ফল। দুইবার নাকি তাঁহার বিবাহ করিবার আকাঙ্খা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার আয়ে পরিবার প্রতিপালন সম্ভব হইবে কি না চিন্তা করিতে তিনি এত সময় লইলেন যে মনোনীতা নারীটীর আর ধৈর্য রহিল না, তিনি অন্যের পানিগ্রহণ করিয়া ফেলিলেন। দ্বিতীয়বারও তাঁহার মত স্থির করার দীর্ঘ সময়ে ধৈর্য রাখিতে না পারিয়া নারীটী অন্যত্র চলিয়া যান। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে গভীর চিন্তা না করিয়া এই ভদ্রলোক কোন কাজই করিতেন না—বিবাহও না। সুতরাং যে সব সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা হঠাৎ গৃহীত নয়।

নিয়মকে তিনি এত শ্রদ্ধা করিতেন যে নিজের কোন কাজেই অনিয়ম ছিল না। মোজার গার্টারগুলি বাঁধার প্রণালীও তাঁহার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল (১)। সরল, সুঠাম জীবন, কিন্তু প্রত্যেকটী কাজের সময় নির্দিষ্ট ছিল। কাজ ত কিছুই নয়! শয্যাত্যাগ, কফি-পান, কিছু লেখাপড়া, ক্লাস পড়ান, আহার, বৈকালিক ভ্রমণ! এই ত জীবন! কিন্তু সময় এত বাঁধা ছিল যে, কাণ্টকে রাস্তায় দেখিয়া লোকে ঘড়ি মিলাইত—সাড়ে তিনটা বাজিয়াছে! নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ, দেখা-সাক্ষাৎ কিছুই নাই! বার মাস একটী রাস্তায় একই পরিমাণ হাঁটিতেন। হঠাৎ বৃষ্টির আশঙ্কা হইলে চাকর ছাতা লইয়া ছুটিত! বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলে পড়ান আর বই লেখা—এই লইয়াই ত ৮০ বৎসর পৃথিবীতে কাটাইয়া গিয়াছেন। দেখিবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক জড় হইত না! সকলে তাঁহার কথার অর্থও বুঝিত না। বক্তৃতা শুনিবার জন্য

( ১ ) The Story of Philosophy—Will Durant.

ভিড়ের চাপে লোক মারা যাইত না। কিন্তু ইতিহাস ত এই ক্ষুদ্র মানুষটীকে ভুলিতে পারিবে না। জার্মন জাতির বর্তমান (১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ) অবস্থা হইতে তাহার ভবিষ্যৎ কল্পনা করা কঠিন। কিন্তু কাণ্ট্ সর্ব পৃথিবীর! ভবিষ্যৎ সভ্যতা ইউরো-আমেরিকার সভ্যতাকে বাদ দিয়া হইতে পারিবে না; ভবিষ্যৎ দর্শন ইউরোপের দর্শন মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না; সুতরাং আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রহের ইতিহাসে এই ক্ষুদ্র মানুষটীর স্থান চিরন্তন। চিন্তায় ইঁহার সাহস অনমনায়; ইঁহার নীতিকথা কঠোর অথচ কোমল; ভাবুকের ভাবনার ধারা বদলাইয়া দেওয়ার শক্তি ইঁহার অসাধারণ!

## ১০। কাণ্টের পরে

কাণ্টের পর ১৯শ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে জার্মনী দর্শনে এমন একটা স্থান দখল করে যাহার তুলনা কম। চারটী নাম এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা আমাদের উচিত; ফিকৃটে (১৭৬২-১৮১৪), হেগেল (১৭৭০-১৮৩১), শোপেন্‌হোর (১৭৮৮-১৮৬০) আর শেলিং (১৭৭৫-১৮৫৪)। ইঁহাদের দর্শনের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু নাম কয়টীরও উল্লেখ না করিলে দর্শনের কাছে অপরাধ হইত!

এই সময়ে জেনা (Jena) নগরের বিশ্ববিদ্যালয় দার্শনিক আলোচনার কেন্দ্র হয়। হেগেলের মত অধ্যাপক আর তাঁহার শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে এমন উপযুক্ত ছাত্র এই উভয়ের সম্মিলনে সোনায় সোহাগা হইয়াছিল। কাছেই ছিল বাইমার (Weimar) সহর; ১৯শ শতাব্দীর জার্মনীর উজ্জয়িনী; আর সেখানে ছিলেন এই শতাব্দীর কালিদাস গেটে (Goethe)। এই যুগে উচ্চ শ্রেণীর কাব্য ও দর্শনের এমন একটা মধুর মিলন ঘটিয়াছিল যাহা ইতিহাসে কদাচিৎ ঘটিয়াছে। হেগেলের মৃত্যুর

সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় এই মহামিলনের অবসান ঘটিয়া যায়। এই যুগের জার্মান দর্শন ও সাহিত্যের বিস্তৃত বিবরণ কুতূহলী কেহ ইংরেজীর সাহায্যেও জানিতে পারিবেন। আমাদের এখানে দিক্ প্রদর্শন ছাড়া বেশী কিছু করিবার অবসর নাই।

কাণ্ট মানুষকে কেন্দ্র করিয়া জগৎ ব্যাপার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কোন্ মানুষ? আমি, আপনি, না আমাদের কোন বন্ধু? কার বুদ্ধি এই নিয়ম শাসিত বাহ্য জগৎ সৃষ্টি করে? কাণ্টের কথাটা অস্পষ্ট থাকিয়া যায়। কিন্তু ফিক্‌টে উত্তর দেন, আমার জগৎ আমিই সৃষ্টি করি, অন্যে নয়। আমার জগতে আমার স্ত্রী পুত্র, গ্রাম নগর, আকাশ ভূমি সবই আছে; কিন্তু এই সবই আমি আমার চিন্তা দ্বারা আমারই প্রয়োজন মত ভাবি। আমার স্ত্রীরও একটা জগৎ আছে—সেটা তিনি ভাবেন; তাহাতে আমারও হয়ত একটা স্থান আছে। জগৎ দুইটী ঠিক এক না-ও হইতে পারে। তবে আলাপ আলোচনার সাহায্যে একটা সাধারণ বিভাজক বাহির হইয়া যায়; আমরা পরস্পরের কথার মানে বুঝি।

এই মতের পক্ষে-বিপক্ষে অনেক যুক্তি আছে ও ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার মূল্য নিরূপণও একাধিক প্রকারে হইতে পারে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার যে ইহাতে ব্যক্তির দাম অত্যন্ত বেশী ধরা হইয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের জগৎ নিজের চিন্তা দ্বারা সৃষ্টি করে বলিলে একটা সাধারণ জগৎ পাওয়ার অসুবিধাও ত আছে; অথচ বিজ্ঞানের জন্য একটা সাধারণ জগৎ প্রয়োজন—ব্যক্তি বিশেষের জগৎ লইয়া সে কাজ করিতে পারে না। আর ব্যক্তিরা ত কেহই চিরস্থায়ীও নয়। সুতরাং আমার জগৎ আমিই সৃষ্টি করি, এই কথাতে তেজস্বিতা যতখানি প্রকাশ পায়, নিছক সত্য হয়ত ততখানি নয়।

কাজেই প্রশ্নটা আবার উঠিল। হেগেল উত্তর দিলেন, পরমাত্মাকে জগৎ-স্রষ্টা ভাবিতে দোষ কি? তিনি অনাদি, অনন্ত, অক্ষর। এই অক্ষরের অনাদি আত্মপ্রকাশের চেষ্টা হইতে জীব ও জগৎ লইয়া সমস্ত বিশ্ব হইয়াছে; অক্ষরের চিন্তা-প্রসূত এই বিশ্ব; এই চিন্তার বিরাম নাই; সেই জন্যই জগতেরও বিরতি নাই। বাহ্য পদার্থে মানুষের চিন্তায়, তাহার রাষ্ট্র, সমাজ ও ইতিহাসে—যুদ্ধে, রাষ্ট্রবিপ্লবে ও যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায়—সর্বত্র এই অক্ষরের চিন্তাশক্তি প্রকাশ পাইতেছে।

আর জগৎ এই চিরন্তন অক্ষরের চিন্তা প্রসূত বলিয়াই যাহা সত্য তাহা চিন্তিত আর যাহা সুচিন্তিত ও তর্কসিদ্ধ তাহা সত্য। বাস্তব ও চিন্তার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। ব্যক্তির চিন্তায় যে ভুল হয় না, তাহা নয়; কিন্তু পরমাত্মার চিন্তায় তাহা অসম্ভব। ব্যক্তির চিন্তা পরমাত্মার চিন্তারই ছায়া মাত্র; সুতরাং অসত্য নয়; কিন্তু ব্যক্তিত্বের সীমার মধ্যে উহা ঘটে বলিয়া উহাতে ভুলের সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু ভুল হইতে পারে বলিয়াই জ্ঞান অ-জ্ঞান হয় না।

কিন্তু জগৎটা কি শুধু তর্কশাস্ত্র সম্মত নিখুঁত চিন্তা মাত্র? একটা ঐতিহাসিক কথা এখানে আবার মনে করিতে হয়।

যে সময়ের কথা আমরা ভাবিতেছি, সেটা ১৮১৫ অব্দের পরে—ওয়াটার্লুর যুদ্ধের পর! কর্সিকার দরিদ্রের ছেলে সেই খাটো ব্যক্তিটী তখন পরাজিত, নির্বাসিত; কিন্তু তার পূর্বে কয়েক বৎসর ধরিয়া এই নেপোলিয়ন ইউরোপে যে পরিমাণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে সমগ্র মহাদেশটা একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। এই খাটো, ফ্যাকাসে লোকটীর একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষাই কি রক্তগঙ্গা বহাইয়া দেয় নাই? বিরাট বিশ্বের একটা ক্ষুদ্র গ্রহ পৃথিবী; তাহার একটা ক্ষুদ্র মহাদেশ ইউরোপ; তাহাতে একটী ক্ষুদ্রকায় মানুষের ইচ্ছা যদি এত ঘটনা ঘটাইতে পারে, তবে সারা বিশ্বে

যেখানে ইহা অপেক্ষা কত বেশী ঘটনা ঘটিতেছে, তাহাতে কি কোন ইচ্ছার প্রকাশ নাই? আছে বলিতে দোষ কি? শোপেনহৌর তাহাই বলিলেন। অবশ্যই শোপেনহৌর নেপোলিয়নের জীবন হইতেই এই ইচ্ছাশক্তির ধারণাটা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এমন না-ও হইতে পারে। কিন্তু চারিদিকের ঘটনা ত দার্শনিকের মনেও একটা ছায়াপাত করে। প্রবল ইচ্ছাশক্তি মূর্ত হইয়া নেপোলিয়নে দেখা দিয়াছিল এবং তাহার ধ্বংসলীলা শোপেনহৌর চোখে দেখিয়াছিলেন।

মানুষের ভিতরে এই ইচ্ছাশক্তি কত প্রবল! বাঁচিবার ইচ্ছা, ভোগের ইচ্ছা, জয়ের ইচ্ছা, বংশবৃদ্ধির ইচ্ছা—মানুষের সমস্ত জীবনই এই প্রকার নানাবিধ ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হইতেছে না? শুধু মানুষ কেন? ইতর প্রাণী, উদ্ভিদ্ ও লতার জীবনেও একটু সূক্ষ্ম ভাবে দেখিলে কি আমরা এই ইচ্ছার খেলা দেখিতে পাই না? অচেতন গ্রহ-নক্ষত্রের আকর্ষণে, চুম্বকের আকর্ষণে—এবং জড়ের অন্যান্য ক্রিয়ায়ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি ইচ্ছাশক্তিই দেখিতে পাইবে।

এই ভাবে শোপেনহৌর সমস্ত জগৎটাকে চিন্তার প্রকাশ না ভাবিয়া একটা বিরাট ইচ্ছার প্রকাশ বলিয়া ভাবিলেন। শোপেনহৌর ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন—বিশেষত বৌদ্ধ দর্শনের সঙ্গে। বৌদ্ধ দর্শনের বাসনা ও কর্ম এবং নির্বাণের কল্পনা ইঁহার চিন্তায় স্পষ্ট ছায়াপাত করিয়াছে। জীবন ও জগৎ দুঃখময়, এ কথাও তিনি বৌদ্ধদেরই মত বলিয়াছেন। উপনিষদের তত্ত্বমসি (সে-ই তুমি) এই মহাবাক্যও তাঁহার জ্ঞাত ছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, ইঁহার চিন্তার তুলনা-মূলক সমালোচনা এ দেশে খুব কমই হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদেরও এখানে স্থানাভাব। ভবিষ্যতের কুতূহলী জিজ্ঞাসুর জন্য এই পর্যন্ত বলিয়া রাখি যে শোপেনহৌর ভারতের দর্শন হইতে অনেক ঋণ লইয়াছেন এবং সে ঋণ তিনি গোপন রাখেন নাই।

এইভাবে যাঁহারা জগৎ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন তাঁহারা মানবাত্মার ভিতরে যে সব উপকরণ পাওয়া যায় তাহারই সাহায্য লইতেন। মানুষ চিন্তা করে, মানুষের ইচ্ছা আছে। সেই সকলের সাহায্যে জগতের আবির্ভাব ও স্থিতি বুঝিবার চেষ্টা হইয়াছে। মানুষের চিন্তা, হয়ত বা আমারই চিন্তা আমার জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে; অথবা পরমাত্মার চিন্তা বা ইচ্ছা হইতেই জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে। জ্ঞাতা হইতে জ্ঞেয় জগৎ ভিন্ন, ইহা ধরিয়া লইয়া সেই জ্ঞেয় বস্তুর একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে, এবং সে চেষ্টা জ্ঞাতা মনের কোন উপাদানের সাহায্যেই হইয়াছে। কিন্তু মানুষের যুক্তি বা চিন্তা বা ইচ্ছা আসে কোথা হইতে? তাহা দ্বারাই জগৎ বুঝিতে হইবে, ইচ্ছা বা চিন্তা শক্তির সাহায্যেই জগৎ বুঝিতে হইবে, এমন কি কথা? জগৎ দ্বারা এ সকলকে বুঝা যায় না? অ-যুক্তি, অ-চিন্তা, অনিচ্ছা দ্বারা যুক্তি, চিন্তা ও ইচ্ছার উদ্ভব কল্পনা করা যায় না? মানুষের দৈহিক জীবন যে যুক্তি-হীন ও চিন্তা-হীন, বাহিরের জড় ও অচেতন জগতের উপর নির্ভর করে, ইহা ত স্পষ্ট; তাহার সকল জীবন এই তথাকথিত জড় ও অচেতন হইতে আসে, ভাবিতে কি পারা যায় না? ইহা অধর্ম হইবে না; ইহাতেও ঈশ্বর স্বীকৃত হইতে পারেন। অ-চৈতন্য, অ-যুক্তি ও অ-চিন্তা ও উদ্দেশ্যবিহীন ইচ্ছার ভিতর দিয়া ঈশ্বর সৃষ্টি আরম্ভ করেন; তাহাই বাহিরের জগৎ; তারপর ক্রমে মানুষে পুষ্ট ও স্ফুট চিন্তা ও ইচ্ছার আবির্ভাব হয়—ক্রমে সে তাহার স্রষ্টার নিকটবর্তী হইয়া তাঁহাকে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, ইচ্ছাময় রূপে দেখে, ইহাও ত বলা চলে! পূর্বে আলোচিত দার্শনিকদের সমসাময়িক কালে শেলিং জার্মণীতে এইরূপ একটা মত অত্যন্ত তেজের সহিত প্রচার করিতে

থাকেন। তাঁহার চিন্তায় একটু রহস্যের কুহেলিকা, একটু কাব্যের ছায়া যে না রহিয়াছে, তাহা নয়; কিন্তু তাহাতে তাহার দার্শনিক মূল্য কমিয়া যায় নাই। যে বাহ্য প্রকৃতিকে লইয়া এত গোল—কাহারও মতে উহা মানবাত্মার সঙ্গে সম্পর্কহীন—কাহারও মতে মানুষের বা পরমাত্মার চিন্তা বা ইচ্ছা হইতে উৎপন্ন—সেই বাহ্য প্রকৃতিকে তিনি সৎ মনে করিয়াছেন এবং তাহার ভিতর দিয়াই ক্রমশ আত্মার প্রকাশ ও বিকাশ হইয়াছে, এই কথা বলিয়াছেন। এই মত পরবর্তী ক্রমবিকাশ শাস্ত্রের অনুরূপ হইলেও উভয়ে ঠিক এক বস্তু নয়। ক্রমবিকাশ যে ভাবে মানুষকে প্রকৃতির সন্তান মনে করিয়াছে, শেলিং তাহা করেন নাই; প্রকৃতি হইতে মনের আবির্ভাবের ভিতর ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশের কথাটাও তিনি বসাইয়াছেন এবং সেইজন্য তাঁহার চিন্তায় আধ্যাত্মিকতা লুপ্ত হয় নাই।

যে চারিজন দার্শনিকের উল্লেখ আমরা এখানে করিয়াছি, তাহা ছাড়া এই যুগে আরও কয়েকজন প্রসিদ্ধ মনীষী আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদের কথা পৃথক্‌ভাবে তুলিতে পারিতেছি না। ছোট বাড়ীতে বেশী লোক নিমন্ত্রণ করিয়া জড় করিলে বিশিষ্ট সমাদর যাঁহাদের প্রাপ্য তাঁহাদের আদরের ত্রুটি হইতে পারে,—আসনও না পাইতে পারেন; সুতরাং আমাদের সংযত হইয়া চলিতে হইতেছে।

## ১১। দর্শনের কারামুক্তি

এ পর্যন্ত আমরা যে কয়জন দার্শনিকের নাম করিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে শেষজন অর্থাৎ শোপেনহোর মারা যান ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে। ইহার আগের বৎসর (১৮৫৯) বিলাতে ডারুইন "প্রজাতির উৎপত্তি" ('Origin of Species') নামক একখানা গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

ডারুইনের আগে এবং সমসাময়িককালে আরও একাধিক ব্যক্তি এই ধরণের সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন; কিন্তু ডারুইন-ই সাহস করিয়া এই চিন্তাকে একটা স্পষ্ট রূপ দেন। ইহা হইতে এক বিপ্লবকারী চিন্তাধারার সৃষ্টি হয়; পূর্বের গৃহীত অনেক বিশ্বাসের দুর্গে ফাটল ধরে, অনেক সৌধ ভাঙ্গিয়া পড়ে; দর্শনেরও বিনা সর্তে কারামুক্তি সম্পূর্ণ হয়।

মধ্যযুগে দর্শন ধর্মের অধীন ছিল, সে কথা আমরা বলিয়াছি। ১৯শ শতাব্দীতেও ইহাকে পূর্ণ স্বাধীনতা পাইতে বেগ পাইতে হইয়াছে। ১৮শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অর্জিত হয় নাই। কাণ্ট ধর্ম সম্বন্ধে একখানা বই লিখিয়াছিলেন। দার্শনিক-দের ধর্মমত সাধারণত যেরূপ হওয়া উচিত, সেরূপ মতই তিনি উহাতে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। স্বভাবতই গীর্জাপতিদের তাহা পছন্দ হয় নাই। রাজার কাছে নালিশ হইল। কাণ্ট গভর্ণমেণ্টের বেতন ভোগী অধ্যাপক। ১৭৯৪ সালে কাণ্ট প্রুশিয়ার রাজদরবার হইতে এক আদেশ পাইলেন; তাহার অর্থ এই:—"আপনি পবিত্র খ্রীষ্টধর্ম ও ধর্মশাস্ত্রের মৌলিক শিক্ষার বিরুদ্ধ কথা দর্শনের অপব্যবহার দ্বারা লোককে শিখাইতেছেন। ইহা জানিয়া আমরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছি। এরূপ আর করিবেন না। ভবিষ্যতে এরূপ করিলে ফল আপনার পক্ষে খারাপ হইবে।" কাণ্ট উত্তর দিয়াছিলেন যে "চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই ধর্ম সম্বন্ধে একটা নিজস্ব মত গঠন করিবার এবং তাহা প্রকাশ করিবার অধিকার আছে। তবে, বর্তমান রাজার রাজত্বকালে আমি আর এ বিষয়ে কিছু বলিব না।"

এই ঘটনা হইতেই বুঝা যায় যে, ১৮শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্তও দর্শন ধর্মের শাসন সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারে নাই। বলা

বাহুল্য, ইউরোপে ধর্ম অর্থ খ্রীষ্টের ধর্ম। কিন্তু ইহার শাসন আস্তে আস্তে শিথিল হইতে থাকে; একদিকে বিজ্ঞানের ক্রম-বর্ধমান আবিষ্কার, অপর দিকে দর্শনের নির্ভীক চিন্তা; উভয়ে মিলিয়া ধর্মের প্রাচীন প্রতিষ্ঠা ক্রমশ ক্ষীণ করিয়া দিতে থাকে। এমন সময় আসে ডারুইনের যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত—ক্রমবিকাশ। ইহা প্রধানত প্রাণীবিদ্যা ও জীববিদ্যার সিদ্ধান্ত; কিন্তু দার্শনিকেরা অতি দ্রুত ইহার মূল নীতি গ্রহণ করিয়া ফেলেন এবং তাহা হইতেই ধর্মের শাসন মানিবার আর কোন দায়িত্ব দর্শন স্বীকার করে নাই। একটা সত্য এই যে, ইউরোপের আধুনিক দর্শন বিজ্ঞানের সঙ্গেই মৈত্রী বেশী রাখিতে চায়। গোড়াতে জ্যোতিষ ও গণিতের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। স্পাইনোজা জ্যামিতির অনুকরণে প্রতিজ্ঞা, প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত এই তিন অবয়বে দার্শনিক চিন্তাকে আকার দিতে চাহিয়াছিলেন। লক্ প্রভৃতি অনেকের বেলায় মনোবিদ্যার উপর দর্শন আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিল। ১৯শ শতাব্দীতে ডারুইনের পর হইতে জীববিদ্যার আশ্রয় ও সাহায্য দর্শন অত্যন্ত বেশী লইয়াছে। আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্য পর্যন্ত ইহাই চলিতেছে। অবশ্যই গণিত ও পদার্থবিদ্যা---বিশেষত পরমাণু সম্বন্ধে পদার্থবিদ্যার আবিষ্কার ও সিদ্ধান্ত—এখনও প্রভূত প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

ক্রমবিকাশের সিদ্ধান্ত ডারুইনের একার কৃতিত্ব ঠিক নয়; তবে তাঁহার নামের সঙ্গেই ইতিহাস প্রধানভাবে এই মত যুক্ত করিয়া রাখিয়াছে; আর এই মত গঠনে তাঁহার দানও প্রচুর। ইহার মূল সিদ্ধান্ত এখন সকলেই প্রায় জানে; লৌকিক ভাষায়—কতক উপহাস ছলে, কতক সত্য হিসাবে, মানুষ বানরের সন্তান, এই এক কথায়ই উহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা হয়। ইহার মধ্যে এমন বিপ্লবাত্মক

কথা কি আছে? যাহারা জীব-জন্তু, বৃক্ষ-লতা, প্রস্তর-মৃত্তিকায়ও ভগবান দেখিতে পারে, তাহাদের প্রাণে এরূপ কথা মোটেই আঘাত করিবে না। বিশেষত ভারতের ঐতিহ্যে একজন বানর 'মহাবীর' আখ্যা পাইয়াছেন; তাঁহার স্তব আছে, মন্দির ও মূর্তি আছে, সুতরাং পূজাও আছে। রামের সেবক ছিলেন বলিয়া তিনি এদেশের অনেকের সেবা পাইয়া থাকেন। সুতরাং মানুষ বানরের বংশধর, এ কথায় এ দেশের লোক চটিবার মত তেমন কিছু দেখিবে না, হয়ত। কিন্তু প্রথমত, কথাটা এত সহজ নয়; আর দ্বিতীয়ত, ইহার মূল সিদ্ধান্ত বাইবেলের ধর্মে প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছে।

মানুষ বানরের সন্ততি, ক্রমবিকাশ কেবল এই মাত্রই বলে না। মানুষ তাহার বর্তমান পরিণতি—বর্তমান দেহ—ক্রমশ লাভ করিয়াছে। সভ্য মানুষের আগে বর্বর ছিল; বর্বরের আগে এমন এক জাতি ছিল যাহারা বানর ও অতি-বর্বরের মধ্যবর্তী; মানুষের দেহের অব্যবহিত পূর্বপুরুষ জগতে বর্তমানে বিদ্যমান নাই; তবে এক সময়ে ছিল, তাহা মনে করিবার যুক্তি আছে; এবং বিভিন্ন স্থানে মাটির নীচে প্রাপ্ত কঙ্কাল ও করোটি একটা প্রমাণও বটে। মানুষই যে কেবল এই ভাবে ক্রমশ উন্নততর দেহ পাইয়াছে, তাহা নয়; সব জন্তুর বেলায়ই এইরূপ একটা ক্রমোন্নতির হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ ধারা আছে। উদ্ভিদও এই নিয়মের মধ্যে পড়ে। সর্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে, সমস্ত জীবন-ধারী দেহ—উদ্ভিদ, প্রাণী, মানুষ—এক আদিম জীবিত অণু হইতে ক্রমশ নানা দিকে এবং নানা ভাবে বিবর্তিত ও বিকশিত হইয়া জগতে বর্তমানে দৃশ্যমান বহুবিধ জাতি-প্রজাতির সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং বানরই কেবল মানুষের পূর্ব-পুরুষ, তাহা নয়; কৃমি-কীটের সঙ্গে, উদ্ভিদ ও সিংহের সঙ্গেও

তাহার গোত্রের সম্বন্ধ রহিয়াছে; তবে সকলেই সপিণ্ড জ্ঞাতি নয়, এই পর্যন্ত। এই ভাবে আদিম জীবাণু হইতে তাহার বর্তমানে বিদ্যমান বিভিন্ন শাখা অতিক্রম করিয়া মানুষ পর্যন্ত পৌঁছিতে কোটি কোটি বৎসর লাগিয়াছে।

ক্রমশ বিস্তৃত হইয়া এই অভিমত মানুষের দেহের পরে তাহার মন, তাহার নীতি, তাহার সমাজ, তাহার সব কিছুতেই প্রযুক্ত হইতে লাগিল। ক্রম-বিকাশের সূত্র দ্বারা সমগ্র মানুষকে বুঝিতে চেষ্টা করা হইতে লাগিল। আরও বিস্তৃত করিয়া এই এক বিকাশ-বাদের সাহায্যে সমগ্র বিশ্ব ব্যাখ্যার চেষ্টাও হইতে লাগিল। ইংলণ্ডে এবং ফ্রান্সে পূর্ণ উদ্যমে এই প্রকার বিশ্ব-ব্যাখ্যা এখনও চলিতেছে। তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত আমরা পরে দিতেছি।

জীবনের উৎপত্তি—বিবিধ প্রকার উদ্ভিদের, প্রাণীর বিবিধ জাতি প্রজাতির আবির্ভাবের এই কাহিনী ধর্মে আঘাত করিল কোথায়, বুঝিতে হইলে বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব স্মরণ করিতে হয় *। তাহাতে প্রধানত যে কয়টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা গিয়াছে তাহা এই: (১) ঈশ্বর সৃষ্টির আগে ছিলেন; (২) তিনি সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া ছয়দিনে এই চরাচর সমাপ্ত করেন; (৩) বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী ইত্যাদিকে তিনি পৃথক্‌ভাবে সৃষ্টি করেন; (৪) ইহারা এখন যেমন আছে, এই ভাবেই সৃষ্ট হইয়াছিল—অর্থাৎ সিংহ সিংহের মত, আর কেঁচো কেঁচো হইয়াই সৃষ্ট হইয়াছিল; (৫) সকলের পরে—সকলের উপরে কর্তৃত্ব করিবার জন্য মানুষ সৃষ্ট হয়—ঈশ্বরের মত হইয়া তাঁহারই মূর্তিতে সে সৃষ্ট হয় †। মানুষ ঈশ্বরের মূর্তি পাইয়াছে,

---

* Book of Genesis; ch. I, দ্রষ্টব্য।

† "God created man in His own image"—gen I. 27.

একথা বিজ্ঞান ও দর্শনের পক্ষে খুব বড় নয়; আর সে পৃথিবীর অন্য সব জীব-জন্তুর উপর প্রভুত্ব করে, ইহাও ত সত্যই। কিন্তু বাইবেলের এই সৃষ্টিতত্ত্বের অন্য অনেক কথাই দর্শন ও বিজ্ঞানকে অস্বীকার করিতে হইয়াছে। বাইবেলের বর্ণনাভঙ্গি অনুসারে পৃথিবীই সৃষ্টির কেন্দ্র; ইহা অনেক আগেই বিজ্ঞান অপ্রমাণ করিয়াছে; ছয়দিনে বিশ্ব-সৃষ্টি সমাপনও বিজ্ঞান গ্রহণ করিতে পারে নাই। এ সব ঝগড়া অনেক আগেই হইয়াছিল।

ক্রমবিকাশ নূতন করিয়া এই ছয় দিনে সৃষ্টি সমাপন অসম্ভব প্রমাণ করিয়াছিল, কারণ, কীট হইতে মানুষে আসিতে যে অনেক দীর্ঘ কাল লাগিয়াছে! তারপর বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর পৃথক্ সৃষ্টিও ক্রমবিকাশ মানে না; সৃষ্টির কথাটাই উঠে না—ঈশ্বরের কর্তৃত্বের কথাও নয়; তবে, যদি সৃষ্টি মানিতেই হয়, তবে আদিম জীবাণু হইলেই যথেষ্ট হয়, তারপর, বাহ্য প্রকৃতি আছে, আর ক্রমবিকাশ আছে; সময়ে বিচিত্র জগৎ আসিবে এবং আসিয়াছে-ও। এ সমস্তই শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কথা। সুতরাং শাস্ত্রের রক্ষকেরা এই মতকে বিগর্হিত ঘোষণা করিলেন। ডারুইনের জীবদ্দশায়ই এই সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া গেল; ডারুইন অসহায় ছিলেন না; হক্‌স্‌লি প্রভৃতি অনেকে ইংলণ্ডে এবং বাহিরে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। এখনও এই বিবাদ সমাপ্ত হইয়াছে বলা যায় না; তবে ইহা স্পষ্ট যে পুড়াইয়া মারিবার ভয় দেখাইয়া গেলিলিওর বেলায় যাহা সম্ভব হইয়াছিল, চাকরী যাওয়ার ধমক দিয়া কাণ্টের বেলায় যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা আর আজ পাশ্চাত্ত্য জগতে সম্ভব নয়; দর্শন এখন পূর্ণ স্বরাজ লাভ করিয়াছে; ধর্মের ভ্রূকুটিতে সে আর তাহার যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নয়। প্রয়োজন মত

ধর্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধ কথাও সে আজ অনেক বলে; এবং স্বয়ং ভগবানের সম্বন্ধেও প্রকাশ্য আলোচনা করিতে আর কুণ্ঠিত নয়। ইহার অর্থ এই নয় যে, ক্রমবিকাশের সকল সিদ্ধান্তই গৃহীত হইয়াছে; কিছু পরিত্যক্ত এবং কিছু পরিবর্তিত হওয়া স্বাভাবিক; এবং হইতেছে ও হইবে-ও; কিন্তু এই সংগ্রামের পর দর্শনের পূর্ণ-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; শাস্ত্রের দোহাই দিয়া এখন আর তাহাকে দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা কেহ করিবে না, আশা করা যায়।

## ১২। ক্রম-বিকাশের মূল কথা

ক্রম-বিকাশ প্রধানত জীববিদ্যার কথা। এই মতের মূল বক্তব্য কয়টী সংক্ষেপে এই—( ১ ) জীব বাহ্য প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, বিশেষত খাদ্যের জন্য; ( ২ ) কোন এক জায়গার জলবায়ুর পরিবর্তনে জীবদেহের পরিবর্তন ঘটে; ( ৩ ) কোন এক স্থানে জীবের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে অনেক সময় খাদ্যাভাব ঘটিতে পারে; ( ৪ ) খাদ্য-চেষ্টা ও বংশবৃদ্ধির প্রবৃত্তি জীব মাত্রেরই আছে; ( ৫ ) খাদ্য ও প্রণয়িনী সংগ্রহের জন্য জীবে জীবে কলহ হইতে পারে এবং হয়; ( ৬ ) প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে দেহের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যও চেষ্টা করিতে হয়; ( ৭ ) খাদ্য সংগ্রহ দ্বারা এবং প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া দেহ রক্ষা করা এবং নিজের বংশ স্থায়ী করিবার জন্য স্ত্রী সংগ্রহ করা—এই উভয় ব্যাপারেই অনেক সময় প্রাণীদিগকে সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হয়; ইহারই নাম 'জীবন সংগ্রাম' * ; ( ৮ ) এমন হয় যে কোন কোন জীবের দেহে অকস্মাৎ কতক পরিবর্তন ঘটিয়া যায়; যেমন, হঠাৎ

* "Struggle for existence"

নখগুলি প্রখর হইল অথবা লেজটা খসিয়া পড়িল অথবা পা কয়টী দীর্ঘ হইয়া গেল; (৯) এই সব অসাম্য বা পরিবর্তন জীবন সংগ্রামে কখনও স্থবিধাও করিয়া দেয়; (১০) যে কারণেই হউক সংগ্রামে জয়ী যে হয় সে বাঁচে, তাহার বংশ থাকে; আর যে পরাজিত হয়, সে নির্মূল হয় অথবা স্থানান্তরে আশ্রয় লইয়া পরিবর্তিত দেহ লইয়া বাঁচিয়া থাকে। যুদ্ধের পর সর্বশ্রেষ্ঠেরই স্থায়িত্ব হয় *; এই ভাবেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকার প্রাণীর আবির্ভাব হইয়াছে। (১১) এই সব প্রাকৃতিক ক্রিয়ার সঙ্গে মানুষের যত্নও যোগ করিতে হইবে। তাহা দ্বারাও অনেক প্রাণীর দৈহিক ও অন্যবিধ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যেমন, শিয়াল আর কুকুরের বংশ এক; কিন্তু পুরুষানুক্রমে মানুষের যত্নে পালিত হইয়া কুকুরের দেহের ও স্বভাবের অনেক পরিবর্তন ত হইয়াছে।

এইসব নিয়ম ন্যূনাধিক উদ্ভিদের বেলায়ও প্রযোজ্য। আঙ্গুরের গাছ বাংলা দেশে লাগাইলে হয় ফলিবে না, নয়ত অন্য রকম ফল দিবে; প্রাকৃতিক প্রতিবেশ পরিবর্তনের ফলে অনেক উদ্ভিদের বেলায়ই ইহা ঘটে। আর, বাগানে ও টবে মানুষ যে সব উদ্ভিদকে যত্নে রাখে, তাহাদেরও পূর্বপুরুষ বনে ছিল এবং জ্ঞাতিরা এখনও আছে; কিন্তু গৃহ-পালিত উদ্ভিদ এত রূপান্তরিত হইয়াছে যে, তাহার বংশ খুঁজিয়া বাহির করা দুষ্কর।

দেহের আকস্মিক পরিবর্তন হয় কিনা, তর্ক উঠিয়াছে; কেহ বলিয়াছেন, আকস্মিক না বলিয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিলে দোষ কি? দোষ কিছু নাই হয়ত, তবে এই সব সামান্য কাজের জন্য ঈশ্বরকে বাঁচাইয়া রাখিয়া আর কত লাভ হইবে? দেহের পরিবর্তন

* "Survival of the fittest"

হয় এইটী স্বীকৃত; ইহা আকস্মিক অর্থাৎ অজানা কারণে ঘটিত, না ঈশ্বরের অভিপ্রেত, তাহা অমীমাংসিত থাকিলেও আসল সিদ্ধান্তের কোন ক্ষতি হয় না। দেহের পরিবর্তন, প্রাকৃতিক প্রতি-বেশের পরিবর্তন, খাদ্য ও স্ত্রীর নিমিত্ত সংগ্রাম এই চারিটী প্রধান সত্য; তারপর, ইহা জানা কথা যে, সংগ্রামে সেই জয়ী হয় যাহার শক্তি বেশী। পৃথিবীতে এখন যে সব জাতির প্রাণী আছে তাহারা অতীতে অনেক সংগ্রামের বিজয়ী; কিন্তু সংগ্রাম এখনও চলিতেছে;—মানুষে পশুতে, যক্ষ্মার জীবাণু ও মানুষে, মানুষে মানুষে—কত রকম সংগ্রাম অহরহ এখনও চলিতেছে! আপাতত মানুষ জয়ী;—হাতী, ব্যাঘ্র, সিংহের উপরও জয়ী, আবার মশা, মাকড় এবং কলেরা বসন্তের বীজের উপরও জয়ী; কিন্তু যুদ্ধ এখনও থামে নাই। মানুষে মানুষে যে সংগ্রাম হইতেছে তাহার শেষ পরিণতিও ত এখনও অজ্ঞাত; কোন্ জাতির মানুষ ধরিত্রীর ভবিষ্যৎ মালিক? সাদা, না পীত, না কাল, না তামাটে? তাহার উপর, মানুষ এবং অন্য প্রাণীর যুদ্ধও ত চলিতেছে? পূর্বে পরাজিত অনেক জীবের কঙ্কাল এখনও ভূগর্ভ ও পাহাড়ের গহ্বর হইতে আবিষ্কৃত হয়। ইহা কি একেবারেই অকল্পনীয় যে একদিন মানুষেরও কঙ্কাল ভবিষ্যৎ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আবিষ্কার করিয়া আলোচনা করিবে এবং দুই একটী মানব-মিথুনকে নমুনা স্বরূপ খাঁচায় রাখিয়া দূর ভবিষ্যতের সভ্যতার অধিকারীরা তাহাদের আলোচনা করিবে? হয়ত কোন মাকড়সা অথবা প্রজাপতি অথবা আধুনিক চক্ষে অদৃশ্য কলেরা বা বসন্তের বাহক কোন অণুবীক্ষণিক জীব মানুষের পরিবর্তে জগতের মালিক হইবে? দূর ভবিষ্যৎ শুধু ক্রমবিকাশের বিধাতাই জানেন!

ক্রমবিকাশের এইসব সিদ্ধান্তের পক্ষে বিপক্ষে অনেক কথাই বলা হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। ভূতত্ত্ব, ভ্রূণবিদ্যা, শারীরতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও সিদ্ধান্ত দ্বারা ইহার সমর্থনের চেষ্টাও হয় এবং ইহাকে অগ্রহণীয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টাও করা হয়; কিন্তু মোটের উপর ইহার সিদ্ধান্তগুলি এত অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের পর গৃহীত হইয়াছে যে, বিপক্ষের কথা খুব বেশী নাই। বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব যাঁহারা না মানিয়া পারেন না তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। দার্শনিকদের মধ্যেও কেহ কেহ এই অভিমতটাকে অপছন্দ করিয়াছেন, এই 'সংগ্রাম' কথাটার জন্য। প্রকৃতিতে কি লড়াইটাই বড় জিনিস?. শুধু হিংসা, শুধু জিগীষাই কি প্রকৃতির নিয়ম? খাদ্যের জন্য আর স্ত্রী পাওয়ার জন্য কলহ ছাড়া প্রকৃতিতে আর কিছু দেখা যায় না? প্রকৃতিতে কি মাতৃস্নেহ নাই? প্রকৃতির নিয়ম অনুসারেই কি মা সন্তানের জন্য দেহটা ত্যাগ করে না? প্রকৃতিতে কি সমাজ ও সঙ্ঘে বাসের মত ত্যাগ ও তিতিক্ষা দেখা যায় না? মৌমাছিদের ও পিপীলিকাদের কি সুশৃঙ্খল সমাজ নাই? তারপর মানুষ যদিই পশুর সন্ততি হয়, তথাপি তাহার উন্নতির গতি ত এইখানেই শেষ হইয়া যায় নাই; দেহেতে তার নূতন কিছু আবির্ভূত হইবে না হয়ত; কেন না, এখন সে দেহের শক্তি বাড়াইবার জন্য যন্ত্র আবিষ্কার করে—চোখ খারাপ হইলে চশমা ব্যবহার করে, দূরের জন্য দূরবীক্ষণ ও ক্ষুদ্রের জন্য অণুবীক্ষণ ব্যবহার করে; সুতরাং বর্তমানের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী চোখ হয়ত সে আর পাইবে না। কিন্তু তথাপি তাহার উন্নতি ত এখনও বাধা পায় নাই। মনের শক্তিতে, চরিত্রে, ধর্মে সে ক্রমশ উপরের দিকেই চলিয়াছে। শরীরের বিকাশ শেষ

হইয়াছে এবং সেইখানেই প্রাণী জগতের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক শেষ হইয়াছে। ইহার পর তাহার ঊর্ধ্ব দিকে অবারিত গতি—উন্নতির পথ উন্মুক্ত *।

এই ধরণের অনেক কথা ক্রমবিকাশের সমালোচনায় গত ৭০।৮০ বৎসর যাবৎ বলা হইয়া আসিতেছে। ইহাতে ক্রমবিকাশের সিদ্ধান্তের কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইয়াছে এবং আরও হইবে হয়ত; কিন্তু তাহাতে তাহার মূল সিদ্ধান্ত অপ্রমাণিত হওয়ার এবং পরিত্যক্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। গাছ উপর দিকে মাথা তুলিয়া আকাশে শাখা প্রশাখা বিস্তৃত করিতেছে বলিয়াই কি ভূমির সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ অস্বীকার করিতে পারে? মানুষেরও তেমনই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উন্নতি তাহার নীচ বংশের পরিচয় চোখের আড়াল করিয়া দিতে পারিলেও অসত্য করিয়া দিতে পারিবে না। প্রায় শতাব্দীর সমালোচনার পরও এই সিদ্ধান্ত টিকিয়া আছে যে, মানুষ ঈশ্বরের মূর্তিতে নির্মিত হইলেও তাহার ঊর্ধ্বতন পূর্ব পুরুষেরা সব মানুষ ছিলেন না; আর বাহিরের জগৎ এবং নিম্নতম জীবনের সঙ্গে সে সম্পর্কহীন নয়।

## ১৩। দর্শন ও ক্রমবিকাশ

ক্রমবিকাশের সিদ্ধান্ত যে প্রধানত জীববিদ্যার বিষয় সে কথা আমরা বলিয়াছি। ইহার মূল সূত্র এই যে জগতে বর্তমানে আমরা যে সব জীব দেখি তারা এই আকারেই সৃষ্ট হয় নাই;—ক্রমশ

* দ্রষ্টব্য—"The Ascent of Man—" by Drummond; "God and the Astronomers"—by Dean Inge; ইত্যাদি।

এই আকার লাভ করিয়াছে। জিজ্ঞাসা হইল, ব্যাপকভাবে এই সূত্র কি সমস্ত জগতের ব্যাখ্যায় ব্যবহার করা যায় না? জগতে একটা গতি ও পরিণতি ত চারিদিকেই দেখা যায়; অবশ্য সাধারণত আমরা উহাতে একটা চক্রবৎ পরিবর্তনই দেখি; ডিম হইতে মুরগী, মুরগী হইতে আবার ডিম, বীজ হইতে ক্রমশ গাছ, গাছ হইতে আবার বীজ; এই রকম পুনরাবৃত্তিই সাধারণ চোখে জগতের নিয়ম মনে হয়। কিন্তু নূতনের আবির্ভাবও জগতে হয়; মানুষের সমাজে নূতন শ্রেণী বা নূতন রাষ্ট্রের আবির্ভাব, সমুদ্রের জলে নূতন দ্বীপ, দূর আকাশে পুঞ্জীভূত নীহারিকা হইতে নূতন নক্ষত্র—এসব কি একেবারেই হয় না? মানুষের নূতন যন্ত্রাদির আবিষ্কার প্রকৃতির পুরাতন নিয়ম অনুসারে হইলেও একেবারে অ-নূতন নয়। আর ১০০—২০০ বৎসরের ইতিহাসে তেমন নূতন কিছু না পাইলেও পৃথিবীর দীর্ঘ আয়ু আলোচনা করিলে —সভ্যতার আবির্ভাবেরও আগে মনশ্চক্ষুর দৃষ্টিপাত করিতে পারিলে—নূতনের আগমন কি চোখে পড়িবে না? সুতরাং জীবের দেহতত্ত্বে মন সীমাবদ্ধ না রাখিয়া যদি সমগ্র জগতের দিকে দৃষ্টি দেই, তবে সেখানেও কি একটা বিকাশের ক্রম দেখা যাইবে না? তাহা যদি ধরিতে পারি তবে, বিশ্ব বুঝিতে কি আমাদের সুবিধা হইবে না? এই জিজ্ঞাসার ফলে ক্রমবিকাশের সাধারণ সূত্র ক্রমশ জীব-দেহ ব্যাখ্যার সূত্র মাত্র না থাকিয়া বিশ্ব-ব্যাখ্যার প্রণালী হইয়া দাঁড়াইল। ইহার ফলে গত (১৯শ) শতাব্দীর শেষ হইতে বর্তমান (২০শ) শতাব্দী পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে একাধিক নূতন ধরণের দর্শন আবির্ভূত হইয়াছে। ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সেই ইহার অনুসরণ বেশী হইয়াছে।

## (১) সর্ব-সমন্বয়ী দর্শন

ডারুইনের জীবিতকালেই ইংলণ্ডে হার্বার্ট স্পেন্সর এই ক্রমবিকাশ সূত্র অবলম্বন করিয়া এক বিস্তৃত ও বিরাট দর্শন প্রণয়ন করেন। স্পেন্সর এতগুলি এবং এত বড় বড় বই লিখিয়াছেন যে, সবগুলি একত্র করিলে একটী ছোটো-খাটো লাইব্রেরী হয়। তাঁহাকে সংক্ষিপ্ত করিতে গিয়া আমাদের একটী গল্প মনে পড়িল; গল্পটীতে শিখিবার আছে, সুতরাং বলি। পারস্যের এক বাদশাহ ছিলেন; তিনি জ্ঞানের সমাদর করিতে জানিতেন। তাঁহার একবার ইচ্ছা হইল জগতের জাতিসমূহের ইতিহাস জানিবেন। রাজ্যের উলেমাদিগকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন এই ইতিহাস লিখিয়া দিতে। বছর কুড়ি পরে কয়েক হাজার উটের পিঠ বোঝাই করিয়া এই ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি বাদশাহের দরবারে উপস্থিত করা হইল। বাদশাহ বলিলেন, 'এ আমি কতদিনে পড়িব? সংক্ষেপ করিয়া আন'; আরও কিছুকাল গেল; সংক্ষেপ যাহা হইল তাহাও কয়েক শত উটের বোঝা! আরও সংক্ষেপের আদেশ হইল; এইবারও দশ উটের বোঝা! বাদশাহ তখন রুগ্ন, শেষ বয়স! রাগিয়া বলিলেন 'আমি কি মরিবার আগে জগতের জাতিদের ইতিহাস জানিয়া যাইতে পারিব না!' আরও সংক্ষিপ্ত হইল—এক উটে আনিতে পারিল। কিন্তু বাদশাহের তখন প্রায় নাভিশ্বাস উপস্থিত! অথচ ইতিহাস জানিবার ইচ্ছা তখনও আছে। একজন তখন কাছে আসিয়া বলিলেন, 'খুব সংক্ষেপে জগতের জাতি সকলের ইতিহাস এই যে, তাহারা আবির্ভূত হইয়াছিল, কিছুকাল ছিল এবং পরে লোপ পাইয়াছে!' বাদশাহের কণ্ঠমুক্ত হইল! এই গল্পের উপদেশ এই যে, খুব বড় জিনিসকেও সংক্ষেপ করা যায়।

প্রায় সব দেশেরই ধর্মশাস্ত্র বলে সৃষ্টির আগে স্রষ্টা ছিলেন। তারপর কোন এক মুহূর্তে তাঁহার সৃষ্টির বাসনা হইল আর সৃষ্টি হইল। কিন্তু আধুনিক চিন্তায় এই মত ক্রমশ পরিত্যক্ত হইতেছে। স্পেন্সরের মতে জগতের আদিম বস্তু যাহা তাহা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়—তাহাকে কোন নাম দেওয়া চলে না, কোন বিশেষণও নয়। তাহাকে জড়ও বলা যায় না, চেতনও না। তাহাকে পৃথ্বীও বলা যায় না, আত্মাও না, কারণ, এ সব ত পরে আসিয়াছে। সেই যে অজ্ঞেয়, অজ্ঞাত এবং অনামা পদার্থ তাহা বিকৃত হইয়া নানাদিকে বিকশিত হইতে লাগিল; প্রথম বিপুল আকাশ ছড়ান নীহারিকা, তারপর নক্ষত্ররাজি, সৌরমণ্ডল, পৃথিবী, বায়ু, জল ও মৃত্তিকা; ক্রমে জীবনের উন্মেষ হইল; ধাপে ধাপে এবং দিকে দিকে এই জীবনের বিচিত্র বিকাশ হইতে লাগিল; এক শুভ অথবা অশুভ মুহূর্তে মন বা বেদনাশক্তি দেখা দিল; তাহারও বিবিধ বিকাশ হইতে লাগিল; ক্রমে মানুষ আসিল; চিন্তাশক্তি আসিল; চারিত্র-নীতি ও ধর্ম ইত্যাদিও আসিল; পরিবার, শ্রেণী, সমাজ, রাষ্ট্র—নানাবিধ প্রকারে মানবের দীর্ঘ ইতিহাস প্রসারিত হইয়া চলিল; ইহা এখনও চলিয়াছে। নীহারিকার কণা হইতে কালিদাসের বা বুদ্ধের আত্মা পর্যন্ত একই বৈচিত্র্যময় শক্তির বিবিধ প্রকাশ-ভঙ্গির লীলা চলিয়াছে। এই বিকাশ একদিনে হয় নাই, এক ধাপেও নয়; কিন্তু একই অজ্ঞেয় পদার্থের ইহা জ্ঞেয় প্রকাশ ও বিকাশ! আমাদের এবং আমাদের বিশ্বের ইহাই জীবনী। এই জীবনীতে অজ্ঞেয় হইতে জ্ঞেয়, সরল হইতে জটিল, ক্ষুদ্র হইতে বৃহতের আবির্ভাব ঘটিতেছে। একটি জীবকোষ হইতে নিউটনের মস্তিষ্কের মত একটা পরমাণু সমষ্টি আবির্ভূত হইতেছে। একটি জীব-মিথুন হইতে পরিবার, পরিবারের পর গোষ্ঠী, সমাজ, রাষ্ট্র আসিতেছে।

এই সমস্ত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় প্রযুক্ত হইয়াছে—নানাদিক হইতে নানাভাবে পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্তের অনুকূল হেতু সংগ্রহ করা হইয়াছে। অজস্র অর্থ-ব্যয়, তিনজন শিক্ষিত ও সুপটু সেক্রেটারীর সাহায্য এবং প্রায় ৪০ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর এই সিদ্ধান্ত সম্বলিত গ্রন্থরাজি স্পেন্সর সমাপ্ত করেন। অর্থ তাঁহার নিজের খুব ছিল না; তবে সংগৃহীত হইয়াছিল। টাকার কথা দর্শনে বেশী বলিতে নাই; সুতরাং ইহার বেশী জানিতে চাহিলে স্পেন্সরের জীবনীতে যাইতে হইবে। স্পেন্সরের প্রথম ও প্রধান গ্রন্থ 'আদিমসূত্র' (First Principles) ১৮৬২ সনে প্রকাশিত হয়; আর তিনি ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাঁহার দর্শনে মগ্ন ছিলেন।

স্পেন্সরের দর্শনে জীব ও জড়, মানুষ ও পশু প্রভৃতি জাতি-ভেদ লোপ পাইয়াছে; এক সময়ে এই সকলকে সনাতন ও অপরি-বর্তনীয় মনে করা হইত। ভারতের বেদান্তে যেমন এক ব্রহ্ম সত্য, স্পেন্সরের তেমনই এক আদিম সত্য আছে—যাহা অবর্ণনীয়, অজ্ঞাত, ও অজ্ঞেয়; কিন্তু বেদান্তের মত জগতের নানাত্বকে স্পেন্সর মিথ্যা বা মায়া বলেন নাই; যে সব পদার্থ আমরা চারিদিকে দেখি, তাহারা সত্য, আদিম অব্যক্তের অভিব্যক্তি; সুতরাং অসত্য নয়। নরে পশুতে, এবং অন্যত্রও ভেদ যাহা হইয়াছে, তাহাও অসত্য নয়; যথার্থ জ্ঞানীর নিকট মায়া নয়; তবে, এই সব বিভিন্ন বস্তু একই পদার্থের বিবিধ অভিব্যক্তি বলিয়া ইহাদের এই ভেদ, বিকাশের প্রভেদ ও তারতম্য মাত্র, সনাতন কিছু নয়।

এই সিদ্ধান্তের একটা ফল এই দাঁড়ায় যে, বিভিন্ন বিজ্ঞানকে একই বিরাট বিশ্ব-প্রপঞ্চের বিভিন্ন অংশের বিচার বলিয়া মনে

করা হয়; সুতরাং তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। তাহারা সমগ্র গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ের মত; সমগ্র আলোচনার বিভিন্ন সোপান মাত্র; একটী হইতে চিন্তা আপনিই অন্যটীতে চলিতে বাধ্য হইবে; এবং এইভাবে সকল বিজ্ঞান মিলিয়া সমস্ত বিশ্বের একটীমাত্র ব্যাখ্যা দিবে। ইহাতে মানুষের সমগ্র চিন্তার একটা বিরাট সমন্বয় ঘটিবে। জীববিদ্যা পদার্থবিদ্যা হইতে একেবারে পৃথক নয়; কেন না পদার্থবিদ্যার পঞ্চভূতের অথবা বহু ভূতের আশ্রয়ে এবং তাহাদের বিকাশের ফলেই জীবন দেখা দেয়। তেমনই, মনোবিদ্যা জীববিদ্যার সহিত সম্পর্কশূন্য হইতে পারে না; কারণ জীবনকে আশ্রয় করিয়াই মন দেখা দেয়। সমাজ-তত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব প্রভৃতিও একই কারণে পদার্থবিদ্যা, মনোবিদ্যা প্রভৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং এই সম্পর্ক অবহেলা করা চলে না। এই সমস্ত বিজ্ঞানের পুঞ্জীভূত জ্ঞান সমন্বিত ও একীকৃত হয় দর্শনে। দর্শন এই কারণেই মানুষের জ্ঞানের চরম বিকাশ ও পরিণতি। দর্শন অর্থই সমস্ত বিজ্ঞানের —পদার্থবিজ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া মনোবিজ্ঞান, ধর্মবিজ্ঞান ও চারিত্রবিজ্ঞান পর্যন্ত—সমস্ত বিজ্ঞানের সমন্বয়। দর্শন সমস্ত বিজ্ঞানকে সমন্বিত করে বলিয়াই স্পেন্‌সর তাঁহার দর্শনের নাম দিয়াছিলেন "সর্ব-সমন্বয়কারী দর্শন *।" আধুনিক যুগের অন্যান্য দার্শনিকের মত স্পেন্‌সর রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্ম ইত্যাদির প্রশ্নও ভাবিয়াছেন। জগতের আদিম পদার্থকে অজ্ঞেয় বলিয়াছেন বলিয়া ধর্মে তাঁহাকে নাস্তিকই প্রায় বলা হইয়া থাকে। গত শতাব্দীর শেষ দিক দিয়া এবং বর্তমান শতাব্দীর আরম্ভে আমাদের দেশে অনেকে স্পেন্‌সরকে তাঁহার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ও নাস্তিক্যবাদের জন্যই পছন্দ করিতেন বেশী।

* "Synthetic Philosophy"

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ব্যঙ্গ কবিতা 'বদলে গেল মতটা' তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। যথা—

"নাস্তিকের এক দলের মধ্যে মিশলাম গিয়ে রঙ্গে ;
হিউম ( Hume ) ও মিল ( Mill ) ও হার্বার্ট
স্পেন্‌সর পড়তে লাগলাম সঙ্গে ;"
ইত্যাদি *।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্পেন্‌সর এতটা উগ্র নাস্তিক ছিলেন কি না, সন্দেহ করা চলে। তবে কোন দার্শনিকের পক্ষেই কোন প্রাচীন ধর্মের ষোল আনা আচার ও বিশ্বাস মান্য করা সম্ভব নহে ;—বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের সাক্ষাতে তাহা আরও অসম্ভব !

## ( ২ ) সৃজনকারী ক্রমবিকাশ ‡

ক্রমবিকাশের মূল সূত্রকে জগৎ-ব্যাখ্যার মূল সূত্র ধরিয়া আরও অনেকে দর্শন রচনা করিয়াছেন। এইভাবে পরিবর্তিত ও প্রপঞ্চীকৃত হইয়া ক্রমবিকাশ নানা আকার ধারণ করিয়াছে—পরস্পর হইতে পৃথক-করণীয় দর্শনে পরিণত হইয়াছে। এই সব দর্শনের একটীর সাক্ষাৎ পাই আমরা ফরাসী দেশের বার্গ্‌সোঁ ( Bergson )র চিন্তায়। তাঁহার মতে ক্রমবিকাশ শুধু জীববিদ্যার বিষয় নয় ; আর, বিশেষ করিয়া উহাকে শুধু ক্রমবিকাশ বলিলে যথেষ্ট বলা হয় না ; উহা 'সৃজনকারী !' একটা অনির্বচনীয় জীবনীশক্তি নানাভাবে কালের ক্রোড়ে অভিব্যক্ত হইয়া একদিকে পদার্থবিদ্যার জড়, অপরদিকে মনোবিদ্যার মন, একদিকে আমাদের

---

* 'হাসির গান'—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

‡ দ্রষ্টব্য—"Creative Evolution" by Bergson.

তথাকথিত বাহ্য প্রকৃতি, অপর দিকে মানুষের সর্বস্ব, তাহার সমাজ, রাষ্ট্র নীতি ইত্যাদি সৃষ্টি করিতেছে। এই সৃজনের জন্য সময় প্রয়োজন; সুতরাং কালই সেই উপাদান যাহা হইতে সব কিছুর সৃষ্টি হইয়াছে। জড় হইতে জীবনের আবির্ভাব হয় নাই; জীবনই জড়কেও সৃষ্টি করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে জড় বলিয়া কিছু নাই; উহা আমাদের ভাবিবার একটা ভঙ্গি মাত্র। আমরা সব জিনিসকেই কোন এক স্থানে আছে ভাবিয়া লই। দেশ বা আকাশই জড়ের আধার। স্থির আকাশ নাই যদি বলি, তবে স্থির জড়ও থাকিবে না। সমস্ত পদার্থই কালের স্রোতে প্রবাহের মত চলিয়াছে। জলের স্রোতের কতক অংশকে পৃথক্ করিয়া ভাবিয়া যেমন তাহার একটা স্থিরত্ব আমরা কল্পনা করিতে পারি, তেমনই কালের স্রোতের প্রবাহকে কল্পনার সাহায্যে কতকটা স্থায়িত্ব দিয়া আমরা চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি স্থির পদার্থ ভাবি। কালের ক্রোড়ে কোন একটা জিনিসের স্থায়িত্ব কল্পনা করিলেই উহা জড় হয়। প্রকৃতপক্ষে স্থায়ীও কিছু নাই, জড়ও নাই। জীবনের প্রবাহ মাত্র সত্য। প্রবাহ বলিতেই কালের কথা মনে আসে। জীবনের স্রোতও কালের স্রোত—একটা বিরাট স্রোত, ইহাই আসল সত্য। জগৎকে যাঁহারা একটা সমাপ্ত, সাঙ্গ সৃষ্টি মনে করেন, তাঁহারা ভুল করেন। ইহা শেষ হয় নাই, হইতে পারে না; কালের স্রোতে যাহা বহিয়া যাইতেছে—পলে পলে পরিবর্তিত হইতেছে, তাহাই জগৎ। এই প্রবাহের মূলে রহিয়াছে একটা অনির্বচনীয় জীবনীশক্তি ( elan vital )! এইভাবে চিন্তিত ক্রমবিকাশ আর একটা যন্ত্রের ক্রিয়ার মত মনে হইবে না। জগৎটা সত্যই যন্ত্রও নয়; ইহা জীবন এবং জীবনের সৃষ্টি—কালের প্রবাহে জীবনের দান! জগৎ যন্ত্রও নয়, জগতের পূর্বে বর্তমান ছিলেন এমন কোন ঈশ্বরের পূর্বকল্পিত ও সুচিন্তিত সৃষ্টিও ইহা নয়। উহা

জীবনের অভিব্যক্তি—ক্রমিক অভিব্যক্তি। জগতে যে জীবন অভিব্যক্ত হইতেছে তাহাই ঈশ্বর। এই ঈশ্বর সসীম, কেন না, সৃষ্টি এখনও শেষ হয় নাই এবং সৃজনী শক্তিকে এখনও বাধা অতিক্রম করিয়া ব্যক্ত

## ( ৩ ) নব-আবির্ভাবক ক্রমবিকাশ *

ক্রমবিকাশের সূত্র ধরিয়া জগতের আরও একরকম ব্যাখ্যা করিয়াছেন ইংলণ্ডের কয়েকজন অতি-আধুনিক দার্শনিক—আলেকজাণ্ডার, লয়েড্ মর্গেন, ইত্যাদি। বার্গসোঁর মতে কাল অত্যন্ত প্রধান, দেশ তত নয়; কালকে স্থিরত্ব দিয়া গতিহীন মনে করিয়া, চিন্তা করিলে 'দেশ'-নামক পদার্থ পাওয়া যায়; যেমন জীবনকে অচল মনে করিলে জড় হয়, ঠিক তেমনই। কিন্তু দেশ কি সত্য নয়? জড়ই কি সত্য নয়? অনন্ত আকাশ জুড়িয়া এত সব সৌর মণ্ডল—নক্ষত্রের পর নক্ষত্র—দূরবীক্ষণ আবিষ্কার করিতেছে, এসব কি কিছু নয়? ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই প্রশ্ন দর্শনে আসে; ১৯শ শতাব্দীর শেষ দিক দিয়াও আসে। সময় যদি সত্য হয়, তবে আকাশই বা নয় কেন? দেশ ও কাল এই দুইটীই মানিয়া লইলে বিশ্ব বুঝা সহজ হয়; কিছুই বাদ দিতে হয় না, কোন জ্ঞাত সত্যকেই মায়া বা মোহ বলিয়া উড়াইয়া দিতে হয় না। দেশ ও কাল এই উভয়ের সম্বন্ধটা পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়া লওয়া দরকার। ইহাদের উভয়ের সম্বন্ধ দেহ ও আত্মার সম্বন্ধের মত। দেশের আত্মা কাল, আর কালের দেহ দেশ। দেহ যেমন আত্মা থাকিলে জীবন্ত হয় আর আত্মা যেমন দেহের ভিতর দিয়াই সক্রিয় হয়, ঠিক তেমনই কাল

* "Emergent Evolution" ( Lloyd Morgan ) দ্রষ্টব্য।

তার ক্রিয়া করে আকাশ বা দেশ জুড়িয়া; আর আকাশে বা দেশে কাল ক্রীড়া করে বলিয়াই সৃষ্টির প্রকাশ হয়। উভয়ের সম্মিলিত ক্রমিক বিকাশই জগৎ। এই ক্রমিক বিকাশে নূতন নূতন গুণের আবির্ভাব হয়। রসায়নে এইরূপ নূতন গুণের আবির্ভাবের দৃষ্টান্ত অনেক আছে। জলজান ( হাইড্রোজেন ) ও অম্লজান ( অক্সিজেন ) এই দুইটী বায়ু একত্র করিয়া জল সৃষ্টি হয়; জলেতে যে সব গুণ আছে তাহা এই মৌলিক পদার্থদ্বয়ের মধ্যে নাই। সুতরাং মূল উপাদানে যাহা নাই, এরূপ গুণ সেই উপাদান দ্বারা ঘটিত যৌগিক পদার্থে থাকিতে পারে। ইহা জগতের নিয়ম।

এখন, দেশ ও কালকে জগতের চির-সংযুক্ত উপাদান যদি মনে করি, আর যদি ভাবি যে ইহাদের সম্মিলিতভাবে বিকাশের একটা প্রেরণা ইহাদের ভিতর আছে, তাহা হইলে সমস্ত জগৎ বুঝিতে আমাদের ত কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। দেশ-কাল বিকশিত হইতেছে; এক এক স্তরে এক একটা নূতন গুণ আবির্ভূত হইতেছে; দেশ-কালের বিকাশের ফলে আসিল জড়—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ—যে সব পদার্থ লইয়া রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার কাজ-কারবার—সেই সব পদার্থ; এই জড় বা অচেতন পদার্থ সমস্ত দেশকাল জুড়িয়া থাকে না—উহার কতক অংশে মাত্র অবস্থিত। আমরা জানি, একটী দূর নক্ষত্র হইতে আর একটী নক্ষত্রের মধ্যে গাঢ় অন্ধকার এবং ভীষণ শীত ছাড়া আর কিছু নাই। সুতরাং রসায়নের ও পদার্থবিদ্যার জড় পদার্থ জগতের সর্বত্র সমানভাবে ব্যাপ্ত নয়; বিশ্বের একাংশে মাত্র অবস্থিত।

এই জড়ের ভিতরও বিকাশের গতি রহিয়াছে; উহার বিকাশের ফলে আবির্ভূত হয় জীবন। ইহা আবার একটি নূতন গুণ। জড়ের সর্বত্র নাই, কেন না সব জড় পদার্থই জীবন্-বান্ নয়, ইহা আমরা

জানি। কিন্তু জীবন জড়েরই গুণ—কোন একটা স্তরে ইহা আবির্ভূত হইয়াছে। বৃক্ষ, প্রাণী, ইহারা সমস্তই জড়াশ্রিত জীবন। দেশ-কাল, জড়, জীবন এই তিনটি ধাপ পাইলাম। কিন্তু এইখানেই বিকাশের শেষ নয়। জীবন-গুণের ভিতরও আবার বিকশিত হইবার প্রেরণা আছে। আর এক ধাপ বিকাশের পর আসে মন। এই মন আপাতত মানুষেই সর্বাপেক্ষা বেশী উন্নত। নিম্ন প্রাণীর মনের শক্তি অপেক্ষা মানুষের মনের শক্তি—স্মৃতি, মেধা, বুদ্ধি, ইত্যাদি অনেক বেশী। জগতের সকল দিকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও আমরা মানুষের মনের চেয়ে উন্নততর মন কোথাও দেখিতে পাই না। ক্রমবিকাশ এইখানেই শেষ হইয়াছে, এমন নয়; জগতের সর্বত্র পরিবর্তনের—বিকাশের গতি এখনও লক্ষিত হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত মানুষের মনের অপেক্ষা বড় কিছু আবির্ভূত হয় নাই। ক্রমবিকাশ দেশ-কাল, জড়, জীবন, মন—এই চার ধাপ অগ্রসর হইয়াছে। পিরামিডের বা মঠের চূড়ার মত ইহা ক্রমশ উপরদিকে সরু হইয়া উঠিয়াছে। দেশ-কালের চেয়ে জড়ের বিস্তৃতি কম; জড় অপেক্ষা জীবন কম বিস্তৃত; আর জীবনের সর্বত্র মন নাই এবং মানুষের মনের বিস্তৃতি আরও কম।

মানুষের মনের মধ্যে পুণ্যাপুণ্য-জ্ঞান, ধর্মজ্ঞান, ঈশ্বরের কল্পনা প্রভৃতি আছে। এগুলি যে সব মানুষের মনেই আছে এমন নয়—কিন্তু মানুষ ছাড়া অন্য জাতির মনে নাই। এ সকলের জ্ঞানও একটা নূতন আবির্ভাব;—ক্রমবিকাশের আপাতত সর্বোচ্চ ধাপে দেখা দিয়াছে। ইহার কি নাম দিব? ভগবদ্‌বোধ বলিলে দোষ কি? অথবা সোজা ভাষায় ঐশ্বর্য বা ঈশ্বরত্ব বলা চলে। ইহার ভিতরে আরও বিকাশের সম্ভাবনা রহিয়াছে; ঈশ্বরত্বের কল্পনা আমাদের যাহা

আছে তাহা বাস্তবে কোথাও আমরা দেখিতে পাই না; আমরা এই ঐশ্বর্য আয়ত্ত করিতে পারি নাই; কিন্তু কল্পনা করিতে পারি। ঈশ্বরত্বের কল্পনা এবং আমাদের নিজেদের ঈশ্বরত্ব-লাভের অভাব এই উভয় হইতেই ইহা বুঝা যায় যে, বিকাশ আরও হইতে পারে। পরিপূর্ণ ঈশ্বরত্ব জগতের কোথাও দেখা যায় না; কিন্তু পরিপূর্ণ ঈশ্বরত্ব বাস্তবে পরিণত হওয়ার সম্ভবনা রহিয়াছে।

তবে ঈশ্বর বা ভগবান্ সম্বন্ধে কি ভাবিব? ভগবত্ত্ব বা ঈশ্বরত্ব নামক গুণ এখনও আবির্ভূত হয় নাই; সুতরাং সাহস করিয়া বলা ভাল যে, ঈশ্বর এখনও নাই; তবে, তিনি আসিবেন; ক্রম-বিকাশের ধারা লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়, যে তিনি আসিতেছেন; কিন্তু এখনও অনাগত। তবে কি ঈশ্বর নাই, এই সিদ্ধান্ত হইল? দর্শনের স্বাধীনতার ইহাও একটা অঙ্গ যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রকাশ্যে অস্বীকার করিতে সে ভয় পায় না। ক্রমবিকাশের এই ধারা অনুসারে —নব-আবির্ভাবক ক্রমবিকাশ অনুসারে—আদর্শ হিসাবে ঈশ্বর আছেন; জগৎ ঈশ্বরের আবির্ভাবের দিকে চলিয়াছে; এই আদর্শের কোন কোন গুণ খণ্ড খণ্ড হইয়া মানুষে প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু তথাপি পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য-সমন্বিত ঈশ্বর এখনও অনাগত। তবে, ঈশ্বরত্বের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে যে জগৎ, সেই সমগ্র জগৎকে যদি ঈশ্বর বলা চলে; তবে, সে ঈশ্বর আছেন *।

কেহ কেহ এই মতটাকে একটু পরিবর্তিত করিয়া বলিতে চান

* "God as actually possessing Deity does no exist but is an ideal, is always becoming; but God as the whole universe tending towards deity, does exist." —Alexander.

যে, জগতের ধাপে ধাপে নূতন গুণের আবিষ্করণের ভিতর যে একটা শক্তির ক্রিয়া রহিয়াছে, তাহাকেই ঈশ্বর ভাবা চলে। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের ধর্ম যাঁহারা চান, তাঁহারা ইহাতে তৃপ্ত হইবেন কি না সন্দেহ ; তবে, বাংলায় একটা প্রবাদ আছে—'নাই-মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল' ; একেবারে ঈশ্বর অস্বীকার করার চেয়ে জগৎ-শিল্পে চির-নিযুক্ত ঈশ্বর মানাই মন্দ কি? আগে মানুষ ভাবিত, ঈশ্বর আদিতে ছিলেন এবং এক সময়ে এই বিশ্ব-সৃষ্টি করিয়াছেন। এখন মানুষকে ভাবিতে বলা হইতেছে, দেশ-কাল আদিতে ছিল :—তাহা হইতে আস্তে আস্তে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আসিয়াছে ; ঈশ্বর এখনও আসেন নাই ;—জগতের ক্রমবিকাশের ফলে আসিবেন আশা করা যায়! এই কথা বলা দর্শনের পূর্ণ স্বারাজ্যের প্রমাণ হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে চিন্তার বিপ্লব কম নয়! আর বিশ্বাসী ধার্মিকের মনে ইহা কতটুকু আঘাত করিবে, তাহাও কল্পনার অতীত নয়!

## সামগ্রী-স্রষ্টা ক্রমবিকাশ *

ক্রমবিকাশকে আর একটু পৃথক্‌ভাবে বুঝিয়া দার্শনিক হইবার চেষ্টা করিয়াছেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতি, রাজনীতিক স্মাট্‌স্‌। শেষ হইয়া গেল যে যুদ্ধ তাহার সময়ে ইনি অনেক বাণী ঝাড়িয়াছেন এবং অনেক আদর্শের বিবৃতি দিয়াছেন। আর তার আগের মহাসমরের ( ১৯১৪-১৯১৮ ) সময়ও উচ্চপদে আসীন থাকিয়া অবসর মত একটু দার্শনিক চিন্তা করিয়াছেন। গান্ধী যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালাইয়াছিলেন, তখন একাধিকবার এই স্মাট্‌স্‌-এর

* দ্রষ্টব্য—"Holism and Evolution"—by J. C. Smuts.

সঙ্গে তাঁহার কথাবার্তা ও কাজ-কারবার হইয়াছে। সে সব রাজনীতির কথা, দর্শনের নয়। দর্শনে ইহার মত এই যে, ক্রমবিকাশ ক্রমশ ক্ষুদ্র হইতে বৃহতের, অংশ হইতে অংশীর, অবয়ব হইতে অবয়বীর সৃষ্টি করে। ইহাই জগতের গতির ও ইতিহাসের নিয়ম। রাষ্ট্রনীতি হইতে সহজেই একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় ওলন্দাজ ও ইংরেজদের উপনিবেশ স্থাপিত হইল ; প্রথমে উভয়ে পৃথক্ ; জার্মনরাও গিয়া কতক জায়গা জুড়িয়া বসিল ; কয়েকটী পৃথক্ ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপিত হইল। ক্রমে ঈর্ষা, দ্বেষ ও লোভ পরস্পরের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করিল—বুয়র যুদ্ধ হইল— ইংরেজরা জিতিল ; আপোস হইয়া ক্ষুদ্ররা সকলে মিলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় একটা যুক্তরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। অংশ সকলের সমন্বয়ে একটা বৃহত্তর অংশী আবির্ভূত হইল। এই বৃহৎ আবার একটা বৃহত্তর বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া সেটীকে আরও বড় এবং শক্তিশালী করিয়া দিল। অংশ মিলিয়া একটা 'সমগ্র' সৃষ্টি করিল।

এই দৃষ্টান্তটী আমাদের, স্মাট্‌স্-এর দেওয়া ঠিক নয়। তবে, ইহ তিনিও ব্যবহার করিতে পারিতেন। আমরা ব্যবহার করিয়াছি তাঁহারা অর্থ স্পষ্ট করিবার জন্য। তিনি অবশ্যই আগে দেহ, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির কথা বলিয়া পরে রাষ্ট্রের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন এবং ১৯১৪ সালের সমরের পর গঠিত 'জাতি-সঙ্ঘের' ( League of Nations ) কথাও তুলিয়াছেন। এই ক্রম বা পর্যায় মূল সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্তন ঘটায় না। "জাতি সঙ্ঘ" যে একটা বৃহত্তর সমগ্র সৃষ্টির প্রয়াস, একথা তিনি বলিয়াছেন। ক্রমবিকাশের ক্রম অনুসারে মানুষের সমাজেও বৃহত্তরের আবির্ভাব হয় এবং হইবে, ইহা তাঁহার সিদ্ধান্ত। * রাষ্ট্রের ইতিহাসে,

* Thus the League of Nations, the chief constructive outcome of the great war is but an expression

দেহের বিকাশে, প্রাণীজগতের ইতিহাসে সর্বত্রই এইরূপে কতকগুলি ক্ষুদ্র একত্র করিয়া বৃহতের এবং ক্রমশ বৃহৎ হইতে বৃহত্তরের সৃষ্টি করাই ক্রমবিকাশের রীতি। এখন হইলে অর্থাৎ ১৯৪৬ সনে, তিনি হয়ত সম্মিলিত জাতিসমূহের শান্তি বিধান সমিতি ইত্যাদির কথাও তুলিতেন। গত মহাসমর হইতে বর্তমানে সমাপ্ত মহাসমর পর্যন্ত সমস্ত পৃথিবীর একটা শাসন প্রণালীর ( World state ) আভাস অনেকেই দিয়াছেন। তাহা হইলে একটা বৃহত্তম মানব-মণ্ডলী গঠিত হয়, সন্দেহ নাই। এইভাবে দেহে, সমাজে, জগতে অল্প হইতে বৃহতের আবির্ভাব যে ক্রমে হয়, ইহাই স্মাট্‌স্‌-এর মূল কথা।

খুব নূতন কথা স্মাট্‌স্‌ কিছুই বলেন নাই ; পুরাতন কথাই একটু ঘুরাইয়া বলিয়াছেন মাত্র, আর, একটা নাম দিয়াছেন নূতন। অন্যে বলিলে হয়ত এই মতের তত সমাদর হইত না ; কিন্তু ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যে স্মাট্‌স্‌-এর পদ-মর্যাদা আছে। একজন কবি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, গরীবের কাব্য কেহ পড়িতে চায় না ; কিন্তু যদি শুনে যে একজন বড়লোক উহা লিখিয়াছেন, তখন উহাতে কত যে রস দেখা দেয়, তাহার অন্ত নাই।* স্মাট্‌স্‌-এরও উচ্চ পদ তাঁহার দার্শনিক চিন্তার সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছে। একজন সেনাপতি ও রাষ্ট্রপতি অবসর বিনোদনের জন্য দর্শন চর্চা করিয়াছেন,

of the deeply felt aspiration towards a more stable holistic human society."—Holism and Evolution, 3rd ed. p. 341;

* ঠিক মনে হইতেছে না, বোধ হয় Dryden এর লেখা ; লাইন কয়টী কতকটা এই ধরণের ;—"Let a Lord but own the lines, And behold ! how the wit shines" ইত্যাদি।

ইহা হয়ত দর্শনের সৌভাগ্য! প্ল্যাতোর একটা বহু-উদ্ধৃত উক্তি আছে, যে, রাষ্ট্রের শাসন যখন দার্শনিকদের হাতে যাইবে, তখনই সমাজের সব অত্যাচার অবিচার দূর হইবে, তাহার পূর্বে নয়। স্মাট্স্ রাষ্ট্রপতিত্ব করিয়া গান্ধীর সময় এবং এখনও যে ভাবে শ্বেতেতর জাতির সঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন এবং করিতেছেন তাহা হইতে প্ল্যাতোর উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় না। তবে প্ল্যাতো ঠিক এই ধরণের দার্শনিকের কথা ভাবেন নাই, ইহাও সত্য।

ভাল ডাক্তার কিংবা উকীল ডাকিবার সময় যেমন আমরা তাহার ব্যক্তিগত জীবন জানিতে চাই না, তাহার ব্যবসায়ের যোগ্যতাই বিচার করি, তেমনই বর্তমানে বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোচনায় ও উহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে আবিষ্কারকের চরিত্র বিচার অপ্রাসঙ্গিক মনে করি। বেকনের দর্শন তাঁহার জীবন হইতে পৃথক্ ভাবেই আমরা দেখি। স্মাট্স্-এর বেলায়ই বা তাহা করিব না কেন? দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি তাঁহার ব্যবহার তাঁহার দর্শন হইতে পৃথক্ বস্তু এবং সে ভাবেই উহা দেখা উচিত। আর, সূক্ষ্ম-ভাবে দেখিতে গেলে তাঁহার এই ব্যবহার তাঁহার দর্শনের সঙ্গে অসমঞ্জসও নয়, হয়ত। একটা বৃহত্তর এবং অধিকতর শক্তিমান্ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে শ্বেত ও শ্বেতেতর জাতিদের উপযুক্ত ও যথাযোগ্য স্থান সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত। সকল মানুষকেই সমান মনে করিলে চলিবে কেন? যাঁহারা জগৎ-রাষ্ট্রের কল্পনা করিয়া সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে একই শাসনের অধীন করিতে চাহেন, তাঁহারাই কি সত্যসত্যই সকল মানুষকে সকল অধিকার সমানভাবে দিতে প্রস্তুত? কোন বৃহতের মধ্যেই সকল অঙ্গের স্থান ও কাজ এক নয়!

দেহেতে প্রত্যেক অঙ্গের একটা নির্দিষ্ট কাজ আছে ; ইহার মধ্যে ছোট বড়র প্রশ্ন তুলিলে, পায়ের কাজ হাত কিংবা মুখের কাজ নাক করিতে চাহিলে, দেহ অচল হইবে না ? ঠিকই ; তবে এসব কথা এত পুরাতন যে স্মাট্‌স্-এর মুখ দিয়া বাহির হইলেও নূতন মনে হইবে না।

কিন্তু স্মাট্‌স্ এই সব ঠিক দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনার জন্যই বই লিখিয়াছেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার নিজের কৃতিত্বে নিজের বিশ্বাস কম। বইয়ের বিজ্ঞাপনে তিনি বলিতেছেন :—"এই বই ঠিক বিজ্ঞানের বইও নয় ; দর্শনেরও নয় ; কিন্তু উভয়ের মিলন হয় যে সব প্রশ্নে তাহারই একটু আলোচনা মাত্র।" * আর এক জায়গায় তিনি বলিতেছেন—"আমার জীবনের কাজ সমগ্র সৃষ্টির প্রয়াসে যতটা ব্যাপৃত রহিয়াছে, সমগ্র সৃষ্টির দর্শনে ততটা নয়। তবে, কার্যের উপর চিন্তার প্রভাব এত বেশী যে, আমার এই চিন্তা বর্তমান সময়ে প্রয়োজনীয় আমার বিপুল কর্ম-সূচী অপেক্ষা কম মূল্যবান মনে হইবে না, আশা করি।" † এই উক্তি হইতে মনে হইবে যে, তিনি তাঁহার দর্শনকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন

---

* "It is a book neither of Science nor of philosophy of some points of contact between the two."—Preface.

† My practical business in life has been concerned more with the action than with the philosophy of the Holism. But such is the ultimate influence of thought on action that the philosophy may yet prove no less important than the programme of action which the dire necessities of our life so urgently call for." (Preface, 3rd Ed.)

বাস্তবে তিনি যে সমগ্র গঠন করিতেছেন তাহাতে শ্বেততর জাতির কি স্থান তাহা ভারতীয়েরা জানে। পৃথিবীর জন-সংখ্যায় শ্বেতেতর জাতির সংখ্যা শ্বেত জাতি অপেক্ষা অনেক বেশী। সমস্ত মানব জাতি যখন একটা 'সমগ্রে' পরিণত হইবে, তখন এই শ্বেতেতর জাতিদের কোথায় স্থান হইবে, তাহা তিনি আদৌ ভাবিয়াছেন কিনা সন্দেহ; ভাবিয়া থাকিলেও খুব উদার ভাবে যে নয়, তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। সম্প্রতি কতকগুলি আইন ('Pegging Act', ইত্যাদি) করিয়া তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় উপনিবিষ্ট ভারতীয়দিগকে এমনভাবে কোণ ঠেসা করিতেছেন, যাহার তুলনা বর্তমান যুগে পাওয়া কঠিন।

স্মাট্‌স্-এর দর্শন আর পুষ্টিলাভ করে নাই; করিবে বলিয়াও মনে হয় না। বয়স হইয়াছে এবং একটু ক্ষমতার গর্বও দেখা দিয়াছে। উহা দার্শনিক চিন্তার অন্তরায়। যে দর্শন তিনি দিয়াছেন, তাহা এমন কিছু নয় যে, আমরা উপেক্ষা করিতে পারিতাম না। কিন্তু আমাদের কেহ কেহ তাঁহাকে সমালোচনার সম্মান দিয়াছেন; তাই আমরা তাঁহার উল্লেখ করিলাম। রাষ্ট্রীয় 'সমগ্র' সম্বন্ধে তাঁহার কার্য ও চিন্তার খুব বেশী মূল্য দেওয়া কঠিন; সাধারণ ভাবে ক্রমবিকাশ পরমাণু হইতে বৃহত্তর জড় পদার্থ আর জীবকোষ হইতে দেহ উৎপাদন করে, ইহা নূতন কথা নয়।

যাহা হউক, ক্রমবিকাশের মূল সিদ্ধান্তগুলি লইয়া নানাভাবে যে সব দর্শন সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের বিবরণ আমরা এইখানেই শেষ করিব। এই সব সিদ্ধান্তের সঙ্গে পরিচয় রক্ষা করিতে দার্শনিক বাধ্য: আর দর্শন যে এই সব সিদ্ধান্ত দ্বারা রূপান্তরিত হইতেছে —এখনও হইতেছে—এই কথাটী আমাদের মনে রাখা উচিত।

## ( ১৪ ) দর্শন, বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান

দর্শনে ক্রমবিকাশের এই আধিপত্য দেখিয়া একটা প্রশ্ন মনে হওয়া স্বাভাবিক ; তবে কি বিজ্ঞান দর্শনকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে ? একটা সময় ছিল—যেমন আরিস্ততলের সময়ে—যখন সকল বিজ্ঞানই দর্শনের অঙ্গীভূত ছিল এবং তাহার পরিপুষ্টির সহায়তা করিত। উনবিংশ শতাব্দীতেও দর্শনকে সকল বিজ্ঞানের রাণী মনে করা হইত। ইংলণ্ডে স্পেন্সর ও ফরাসী দেশে কোঁৎ ( comte ) সমস্ত বিজ্ঞানকেই দর্শনের অধীন মনে করিয়াছেন। দেহের মধ্যে অবয়বের মত প্রত্যেক বিজ্ঞানের একটা নির্দিষ্ট স্থান দেখাইয়া দিয়া সকল বিজ্ঞান দ্বারা লব্ধ জ্ঞানের একীকৃত ও সমন্বিত ফলকে তাঁহারা দর্শন নাম দিয়াছেন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ বিভিন্ন শাসনকর্তার অধীন থাকিলেও যেমন রাজ্যের ঐক্য রক্ষিত হয় রাজমুকুটের নীচে, তেমনই জগতের বিভিন্ন বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান চর্চা করিলেও সকল বিজ্ঞানের শেষ সিদ্ধান্তগুলির ঐক্য ও সামঞ্জস্য বিধান করে দর্শন। দর্শন সম্বন্ধে এই ধারণা এখনও তিরোহিত হয় নাই। তবে সামাজ্যের ধ্বংসের সময় যেমন পরাক্রান্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া মাথা উঁচু করে এবং কেন্দ্রের শাসন মানিতে চায় না, তেমনই এখন দর্শনের ধ্বংসের সময় উপস্থিত না হইলেও প্রাদেশিক শাসন-কর্তারা পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে ; এবং বিভিন্ন বিজ্ঞানের কৃতিত্ব এত বেশী হইয়া চলিয়াছে যে শুধু একীকরণ ও সমন্বয়ের জন্য দর্শনের শাসন মানিতে অনেকে সম্মত নয়। ইহার একটি বড় দৃষ্টান্ত মনোবিদ্যা।

মনোবিদ্যা জন্মাবধি দর্শনেরই অঙ্কে লালিত এবং তাহারই অঙ্গ হিসাবে পরিপোষিত। পৃথক্ বিজ্ঞান বলিয়া সে গৃহীত হয় নাই এবং কোন পৃথক্ বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্তও সে হয় নাই। আত্মা

দর্শনের আলোচ্য; আত্মার দৈহিক জীবনের ক্রিয়া ও বিকাশও সেই জন্যই দর্শনের আলোচনার অঙ্গীভূত ছিল। আত্মা আছে কিনা, তাহার স্বরূপ কি, দেহের সঙ্গে কিরূপ সম্বন্ধ, মৃত্যুর পর কি গতি, ইত্যাদি সব দর্শনের প্রশ্ন। মন রূপে ইন্দ্রিয়ের মধ্যস্থতায় বাহ্য জগতের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ এবং উভয়ের মধ্যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহ্য জগতের জ্ঞান অর্জন, ইত্যাদি কতক মনোবিদ্যা, কতক দর্শনে এ পর্যন্ত আলোচিত হইয়া আসিয়াছে। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, আমরা আত্মা ও মনের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য করিতেছি না। ভারতীয় দর্শনে মনকে একটা ইন্দ্রিয় মনে করা হয়;—আত্মার ইন্দ্রিয়, সুতরাং আত্মা হইতে পৃথক্। ইউরোপীয় দর্শনে উভয়ের মধ্যে এরূপ পার্থক্য কদাচিৎ করা হয়। স্থায়ী আত্মা এবং জ্ঞাতা ও উপভোক্তা আত্মার মধ্যে একটা প্রভেদ করা হয়; যথা শুদ্ধ আত্মা ও ব্যবহারিক আত্মা। দ্বিতীয়টী মনের অনুরূপ। তবে এ সব সূক্ষ্ম বিচার আমাদের এখানে নিষ্প্রয়োজন। মন ইন্দ্রিয় হইলেও আত্মারই দ্যোতক; সুতরাং কম বেশী এ-কার্যে ব্যবহার করিলে শব্দ দুইটীর উপর কোন অবিচার করা হয় না।

যাহা হউক মনোবিদ্যা যতদিন দর্শনের অঙ্গ হিসাবে আত্মার বিচার করিয়াছে, ততদিন শুদ্ধ আত্মার অস্তিত্ব ধরিয়া লইয়া তাহার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, বাহ্য জগতের সঙ্গে সম্পর্ক, জ্ঞান, অনুভূতি, স্মৃতি, কল্পনা, চিন্তা ইত্যাদির আলোচনা করিয়াছে। এই সব আলোচনার ভিতরে স্থির এক আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় নাই। এইখানেই দর্শনের সঙ্গে তাহার নাড়ার যোগ রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ তাহার স্বাধীনতার স্পৃহা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। স্থির আত্মা প্রমাণসাপেক্ষ, স্বতঃসিদ্ধ নয়; প্রমাণও সোজা নয়।

দেখাইবে না। কাজেই, মনোবিদ্যার কর্তব্য কোন্ প্রকার ক্রিয়ায় মানুষ কি প্রকার প্রতিক্রিয়া করে, তাহাই শুধু জানা। আত্ম-তত্ত্ব মনোবিদ্যার বিষয় নয়। কেহ কেহ আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন, আত্ম-তত্ত্ব কাহারও-ই বিষয় নয়—কেন না, আত্মাই ত নাই। এই মতটা খুব যে বেশী গৃহীত হইয়াছে তাহা নয়; তবে কথাটা উঠিয়াছে, আলোচিত হইতেছে, তর্কবিচার চলিতেছে; —কাজেই আমরা উল্লেখ করিলাম। ইহার অব্যবহিত ফল এই দাঁড়াইল যে, মনোবিদ্যা দর্শনের অনধীন একটা স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হইতে চাহিতেছে।

আরও একটা দিকে মনোবিদ্যা দর্শনের অধীনতা, এমন কি সহযোগিতাও অস্বীকার করিয়া স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসাবে অন্যান্য বিজ্ঞানের —পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ইত্যাদির—সমকক্ষ হইতে চাহিতেছে। মনোবিদ্যাও যন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে। বিজ্ঞানে যেমন পরীক্ষাগার ও যান্ত্রিক পরীক্ষা আছে, মনোবিদ্যাও সেইরূপ পরীক্ষাগারে যন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ করিয়া মনকে পদার্থবিদ্যার পদার্থের মত জানিতে চাহিতেছে। যেমন, পায়ে চিমটি কাটিলে এক সেকেণ্ডের কত ভগ্নাংশের পর আমি 'উহু' করি; একটা কাগজে কয়েকটা অর্থহীন শব্দ লিখিয়া চোখের সাম্নে ধরিয়াই সরাইয়া নিলে তাহার কয়টা আমি মনে রাখিতে পারি; ইত্যাদি। এই সব পরীক্ষা দ্বারা মনের বিভিন্ন শক্তি মাপিবার চেষ্টা হয়। এই সব বিচারে মনোবিদ্যা খুব যে বেশী কৃতকার্য হইয়াছে, তাহা নয়; মনের অনেক ব্যাপারই যন্ত্রে ধরা দেয় না—যন্ত্র দ্বারা মাপা যায় না; ইহা অতি সরল সত্য। সুতরাং এই যান্ত্রিক মনোবিদ্যাকে দর্শন খুব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না; বরং অনুকম্পার চক্ষেই দেখে। তথাপি

স্বাতন্ত্র্য-লিপ্সু মনোবিদ্যার ইহাও একটা উদ্যম; সুতরাং আমাদের উল্লেখ করা উচিত।

কিছুকাল আগে ভিয়েনার একজন ডাক্তার (ফ্রয়েড) মনোবিদ্যায় মন দিয়া একটা মত প্রকাশ করেন যে মনের একাধিক স্তর আছে; জ্ঞান উপরে ভাসে; তার নীচে অর্ধজ্ঞান এবং অজ্ঞান নামক দুইটি স্তর আছে। সেখানেও মন আছে, ক্রিয়া করে; অনেক সময়ই ব্যক্তির অজ্ঞাতসারেই ক্রিয়া করে; মূর্চ্ছা প্রভৃতি ব্যাধিতে, বিশেষত স্ত্রীজাতির বেলায়, মনে এই তৃতীয় স্তরে কি সব সুপ্ত স্মৃতি ও আকাঙ্ক্ষা কাজ করে, রোগীকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার স্বপ্ন, স্মৃতি ও কল্পনার বিবরণ সংগ্রহ করিয়া, সে সমস্ত জানিতে পারিলে অনেক রোগের চিকিৎসার সুবিধা হয়। মনোবিদ্যার এই শাখা বা রূপকে কেহ কেহ মনঃসমীক্ষণ (Psycho-analysis) নাম দিয়াছেন। চিকিৎসা শাস্ত্রের অঙ্গ হিসাবে ইহার সাফল্য অনেক জায়গায় দেখা গিয়াছে; কিন্তু যতটা বিজ্ঞাপিত হয়, ততটা হয়ত নয়; কোন চিকিৎসারই কৃতকার্যতার পরিমাণ উহার বিজ্ঞাপন দেখিয়া করা যায় না। আর, এই মতটী কেন্দ্র করিয়া যে সাহিত্য রচিত হইয়াছে তাহার সকল সিদ্ধান্তই নির্ভুল এরূপ মনে করিবারও কোন যুক্তি নাই। এ সমস্ত আমাদের আলোচনার সীমার বাহিরে; সুতরাং দৃষ্টান্ত দিতে বিরত রহিলাম। কিন্তু মনোবিদ্যার এই নূতন বিভাগেও একটা স্বাতন্ত্র্যস্পৃহা—দর্শনের বিরুদ্ধে ঠিক বিদ্রোহ না হইলেও তাহার সহযোগিতা বর্জন করিবার আকাঙ্ক্ষা অস্পষ্ট নহে। সেইজন্যই কথাটা আমরা তুলিয়াছি।

বড় চাকুরে ছেলে যেমন অনেক সময় মাকে বাপকে চিনে না তেমনই মনোবিদ্যা বিজ্ঞান হইতে চাহিয়া দর্শনকে ভুলিয়া যাইতে

চায়। বিজ্ঞানের পদবী পাইলেই মনোবিদ্যা সত্য সত্যই বড় হইবে কিনা তাহা ভাবিবার বিষয়। তবে, প্রতীচীর ইদানীন্তন চিন্তায় মনোবিদ্যাকে একটা স্বাধীন বিদ্যা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা একাধিক ভাবে প্রকাশ পাইতেছে।

দর্শনের অঙ্কে প্রতিপালিত যে মনোবিদ্যা সে-ও আজ দর্শনকে অস্বীকার করিতে চায়; অন্য স্বাধীন বিজ্ঞান তাহাকে অমান্য করিবে, ইহা আর আশ্চর্যের কথা কি? দর্শন এক সময় ধর্মের অধীন ছিল, সে অধীনতা হইতে সে মুক্ত হইয়াছে। বিজ্ঞানের অধীনতাও সে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয়। তবে, বিজ্ঞান যাহাই ভাবুক, দর্শন এখন সব বিষয়েই বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসমূহ বিচার করিতে প্রস্তুত। সেইজন্য আধুনিক দর্শনে দেখা যায় কখনও বা পদার্থবিদ্যার সিদ্ধান্ত, কখনও বা জীববিদ্যার ক্রমবিকাশের মত সিদ্ধান্ত আধিপত্য করিতেছে; সেই সব সিদ্ধান্তকে সূত্র করিয়াই দর্শন জগৎ ব্যাখ্যা করিতে চাহিতেছে। এইভাবে আধুনিক কালে দর্শন বিজ্ঞানের সঙ্গে একটা নৈকট্য রক্ষা করিয়াই চলিয়াছে; কিন্তু অধীনতা স্বীকার করিতেছে না। বিজ্ঞানের কোন একটা ধারণার সাহায্য লইয়া জগৎ বুঝিবার চেষ্টা দর্শন করে; কিন্তু সে ধারণাটা অনেক মার্জিত ও শোধিত করিয়া লয়। ক্রমবিকাশ-শাস্ত্র যে জীববিদ্যা হইতে দর্শনে গৃহীত হইয়া অনেক শুদ্ধ ও মার্জিত হইয়াছে, তাহা কি সন্দেহ করা চলে? এইরূপ, আণবিক পদার্থবিদ্যা কিংবা আধুনিক জ্যোতিষও অনেক ক্ষেত্রে দর্শনকে সাহায্য করে—জগৎ বুঝিবার ও বুঝাইবার সুবিধা করিয়া দেয়। কিন্তু তথাপি দর্শন বিজ্ঞানের অধীনতা মানিতে প্রস্তুত নয়; তাহার সোজা কারণ, কোন বিজ্ঞানই সমগ্র বিশ্বের বিজ্ঞান নয়।

দুঃসাহসী বিজ্ঞান গৃহীত ধর্মের বিরুদ্ধ কথা অনেক বলিয়াছে; ছয় দিনে ঈশ্বরের সৃষ্টি-সমাপ্তি, বাইবেলে বর্ণিত নানা অতিপ্রাকৃত ঘটনা, সমুদ্র দুই ভাগ হইয়া যাওয়া, অন্ধের নয়নপ্রাপ্তি—ইত্যাদি সব বিজ্ঞান অস্বীকার করিয়াছে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব লইয়াও প্রশ্ন উঠিয়াছে। এইসব ক্ষেত্রে অনেক সময় দর্শন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত-গুলিকে একটু মোলায়েম করিয়া গ্রহণযোগ্য করিতে চেষ্টা করিয়াছে। এটা অনেকটা মধ্যস্থতার কাজ। আধুনিক দার্শনিক ইহা করেন। কিন্তু ফল সব সময়ই ভাল হয়, বলা যায় না। একজন দার্শনিক দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে মধ্যস্থতা করিতে গিয়া দর্শন উভয়েরই বিরাগভাজন হইয়া পড়ে। তথাপি মনোবিদ্যার বিদ্রোহ এবং অন্যান্য বিজ্ঞানের অবহেলা উপেক্ষা করিয়াও দর্শন এখনও মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছে। যন্ত্রদ্বারা আবিষ্কৃত সত্যই একমাত্র সত্য নয়; আর, পরমাণু ভাঙ্গিয়া তাহার সকল প্রচ্ছন্ন শক্তি ব্যবহার করিতে পারিলেও ঈশ্বর অস্বীকার করিবার কোন যুক্তি পাওয়া যায় না। এখন পর্যন্ত দর্শনে ইহাই গৃহীত পন্থা। দূরের ভবিষ্যৎ আজও অবগুণ্ঠিত।

## (১৫) জীবন ও মন

বিজ্ঞানের যে দুইটী প্রশ্ন বিশেষভাবে আধুনিক দর্শনে আলোচ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা জীবন ও মনের আবির্ভাব। এই প্রশ্ন যে দর্শনে আগে ছিল না, তাহা নয়; কিন্তু অধুনা একটু নূতন আকারে উহা দেখা দিয়াছে। আগে প্রশ্ন হইলে উত্তর সহজ ছিল; ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু এখন ঈশ্বরের সৃষ্টি কোথায় আরম্ভ হইয়াছে, বলা কঠিন; প্রকৃতির সৃষ্টি সহজেই ধরা যায়। গাছ

হইতে বীজ ও বীজ হইতে গাছ হয়; উহা আমরা সব সময়ই দেখি; এই প্রবাহের মধ্যে ঈশ্বরকে কোথাও প্রবেশ করিতে না দিলেও চলে। তারপর, ক্রমবিকাশ অনুসারে একই আদিম জীবন হইতে জীবনের বিবিধ অভিব্যক্তি আসিয়াছে; সেটাও একটা সুদীর্ঘ প্রবাহ; তাহার মধ্যেও ঈশ্বরকে না বসাইলেও চলে।

তারপর জ্যোতিবিদ্যা পৃথিবীকে সূর্যের সন্ততি মনে করে। সূর্যে জীবন ও মনের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। উহা এক বিরাট উত্তপ্ত বাষ্পপিণ্ড। উহা হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছে, শুধু পৃথিবী নয়, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি প্রভৃতি অন্যান্য গ্রহগণও। অন্য গ্রহের কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না; তবে পৃথিবীতে যে জীবন ও মন আছে, তাহা ত স্পষ্ট। পৃথিবী ক্রমশ তাপ হারাইয়াছে; বায়ুমণ্ডল, জল ও স্থলে বিভক্ত হইয়াছে। চন্দ্র পৃথিবী হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া গেলে পর সেখানেও এইরূপ বায়ু ও জলের আবির্ভাব হইয়াছিল হয়ত; কিন্তু এখন নাকি সেখানকার জল সব শুকাইয়া গিয়াছে, বায়ুও নাই, সুতরাং প্রাণীবাস অসম্ভব। পৃথিবীতে এখনও উহা সম্ভব। তাপ বিকিরণ, বায়ুর উৎপত্তি, জলের আবির্ভাব এবং জল ও স্থলের বিভাগ—প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে পর পর ঘটিয়াছে, ইহা ভাবিতে বিজ্ঞানের কষ্ট হয় না।

আরও পরে কোন এক মুহূর্তে জীবন দেখা দিল। জীবন ও জড়ের প্রভেদ ধরা কঠিন নয়। জড় হইতে জড়ের উৎপত্তি হয় না, জড়ের বৃদ্ধি নাই; উহা খাদ্য ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া বড় হয় না; কিন্তু জীবনবান্ জড়ের বৃদ্ধি আছে, আপনার মত জীবনবান্ জড়ের সৃষ্টি করিবার শক্তি আছে। এই সমস্ত জীবনের লক্ষণ। জীবনের আবির্ভাবের পর ক্রমবিকাশের নিয়ম অনুসরণ করিয়া

গেলে, বিবিধ প্রকার জীবনের বিকাশ বুঝিতে বিজ্ঞান আর কোন অসুবিধা বোধ করে না। জীবনের বিবিধ অভিব্যক্তির একটা ধাপে দেখা দিল প্রাথমিক মন। তারপর, আবার ক্রমবিকাশ এবং বিবিধ প্রকার মনের আবির্ভাব—বুদ্ধ, নিউটন, কালিদাস প্রভৃতি; ইহাও বুঝিতে বিজ্ঞানের কোন কষ্ট নাই। জীবন ও মন—উভয়েরই ধাপে ধাপে বিকাশ এখন সহজবোধ্য হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন যাহা রহিয়াছে তাহা প্রথম আবির্ভাবের রহস্য। সেই প্রাথমিক জীবন-অণু—সেই প্রাথমিক মন—কোথা হইতে কিভাবে দেখা দিল?

জড়ের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক স্পষ্ট; দেহ ছাড়া জীবন আমরা দেখি না, জানি না। তেমনই দেহ ছাড়া মনও বিজ্ঞানে অজ্ঞাত। প্রেততত্ত্বে ইহার কথা আছে; দর্শনেও আছে; কিন্তু তাহাতেও তর্ক রহিয়াছে। জীবনবান্ দেহের সঙ্গে মনের যে সম্পর্ক আছে, তাহার স্বরূপ লইয়া তর্ক সম্ভব হইলেও উহার সত্যতা সন্দেহের অতীত।

জীবন ও মনকে যদি একাধার মনে করি, তবে হয়ত প্রশ্নটা একটু সরল হয়। জায়মান দেহে আত্মা প্রবেশ করিলেই উহা জীবিত হয়, ক্রিয়াবান্ হয়, আর আত্মা চলিয়া গেলেই উহা মৃত হয়। জীবন ও মৃত্যুর রহস্য এইভাবে চরমান আত্মা কল্পনা করিয়া প্রাচ্য দর্শন সহজে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছে। সেখানে আত্মা বৃক্ষেও আছে, কীটেও আছে; এবং বৃক্ষ হইতে কীটে কিংবা কীট হইতে মানুষে আসিতে পারে। এইভাবে জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু দর্শন জীবন ও মনের প্রশ্নটা এক হিসাবে সহজ করিয়াছিল। আর আত্মার দেহ প্রাপ্তির জন্য কর্মের কল্পনা করিয়া দেহেতে আত্মা আসে কেন, তাহাও বুঝিতে চাহিয়াছিল।

কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনে আত্মা বলিয়া স্বতন্ত্র সত্তা অস্বীকৃত না

হইলেও অত সহজে কল্পিত নয়। আর সেখানে দেহ হইতে দেহান্তর গমন একেবারে অস্বীকৃত না হইলেও গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং সাধারণ বিশ্বাস নয়। এমন কি, দেহান্তে আত্মার লোকান্তরে অস্তিত্বে—তাহার অমরত্বে—বিশ্বাস একেবারে পরিত্যক্ত না হইলেও উহাও বিচার্য বিষয়; অমীমাংসিত প্রশ্ন; একেবারে সন্দেহের অতীত সিদ্ধান্ত নয়। সুতরাং সেখানে প্রশ্নটীর আকার অন্য প্রকার। জগতের কোন এক গুহ্য স্থানে আত্মারা সব থাকে, কালে কালে কর্মবশে এখানে সেখানে কোন একটা বৃক্ষ, জীব বা মানুষের দেহে প্রবেশ করে, এই কল্পনা পাশ্চাত্ত্যে অগৃহীত। দৃশ্যমান জগৎ লইয়া বিচার করিলে কি দেখা যায়? সূর্য হইতে পৃথিবী; পৃথিবীতে জল ও বায়ু; তারপর প্রাণ ও মন। এই পরম্পরার কি ব্যাখ্যা দেওয়া যায়? জগতের এক অদৃশ্য কোণ হইতে অজানা আত্মা আমদানী করিয়া ইহার ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা;—বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নহে। বিজ্ঞান এখানে কি বলিতে পারে?

অনেক কাল ধরিয়া এবং অনেক বিচার তর্ক চলিয়াছে; মীমাংসা হইয়াছে না বলিয়া তর্ক কি ভাবে হইয়াছে, তাহা বলাই আমাদের কাহিনীর পক্ষে যথেষ্ট। গত শতাব্দীতে এক শ্রেণীর উগ্র বৈজ্ঞানিক বলিতে লাগিলেন, সূর্যেরই মত উত্তপ্ত একটা বাষ্পপিণ্ড পৃথিবী হইতে যদি জল ও বায়ুর আবির্ভাব সম্ভব হইয়া থাকে এবং প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারেই হইয়া থাকে, তবে, সেই নিয়ম অনুসারে সেই উপাদান হইতে জীবনের ও মনের আবির্ভাব সম্ভব হইবে না কেন? উদাহরণ চাই? গাছ কাটিয়া ফেলিলে মরিয়া যায়। তখন উহা আর এক রাশি মৃত্তিকার মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রভেদ সামান্যই। এই মৃত বৃক্ষকে পচিতে দিলে উহা হইতে ক্রমশ কত পোকার আবির্ভাব হইবে! জড় হইতে জীবনের

আবির্ভাব নয়? মৃত্তিকা মৃত; তাহাতেও ত কত পোকা এমনই জন্মে। পচা দুধ, মাংস ইত্যাদি হইতেও ত কত রকম জীবাণুর উদ্ভব হয়।

সুতরাং জীবনহীন জড় হইতে জীবনের আবির্ভাব ত অহরহ-ই ঘটিতেছে। জড়েতে যে সব রাসায়নিক উপাদান আছে, কার্বন, অম্লজান ইত্যাদি, প্রাণীদেহেও সে সবই রহিয়াছে; তবে, ইহাদের অবস্থানটা একটু পৃথক্ ধরণের। বিজ্ঞানের বর্তমান অবস্থায় এই অবস্থানটা আমরা ঠিক জানি না; জানিলে ত এইরূপ অবস্থান ঘটাইয়া ল্যাবরেটরীতে জীবনের আবির্ভাব ঘটান যাইত। ১৯শ শতাব্দীর বিজ্ঞান সে আশাও করিয়াছিল; ২০শ শতাব্দীতেও উহা পূর্ণ হয় নাই সত্য, কিন্তু পরিত্যক্তও হয় নাই। ল্যাবরেটরীতে জীবনের উৎপাদন সম্ভব হউক বা না হউক, উহার আবির্ভাবের প্রণালীতে আর রহস্য কি রহিল? আর জীবনের আবির্ভাব বুঝা গেলে মনের বেলায় আর শক্ত কিছু থাকে না। এই একটা মত খুব প্রবলভাবে সমর্থিত হইয়া আসিতেছে।

অন্যদিকে ইহার প্রতিবাদও রহিয়াছে। সত্যই কি জীবনহীন জড় হইতে জীবনের আবির্ভাব হয়? পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, পচা দ্রব্যে যে কীট দেখা দেয়, তাহা বাতাসের সংস্পর্শ না হইলে ঘটে না। বাতাস ঐ সকল কীটের বীজ উড়াইয়া নিতেছে এবং উহারা অনবরত নানাদিকে যাতায়াত করিতেছে; বৃদ্ধি পাইবার সুবিধা পাইলেই উহারা সংখ্যায় বাড়ে ও বড় হয়। মাছিরা উড়িয়া বেড়ায় ডিম পাড়িবার জায়গা খুঁজিয়া; যেখানে ডিমেরা খাবার পাইবে, বাড়িতে পারিবে, এমন জায়গায়ই ডিম পাড়ে; তারপর ডিম বড় হয়, মাছি হয়। এই ভাবেই কীট ও পোকার বংশ রক্ষিত ও বর্ধিত হয়। অদৃশ্য অনেক জীবাণু ও অনেক জীবের ডিমও এইভাবে বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায়; পচা মাংস ইত্যাদিতে তাহাদের বাড়িবার সুবিধা হয়—বাড়িয়া চলে। পচা মাংস

ইত্যাদিকে বাতাসের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য করিয়া রাখিলে তাহারা বাড়িবে না। রোগের জীবাণুরাও তেমনই বাতাসে ঘুরিয়া বেড়ায়; যক্ষ্মার, টাইফয়েডের, ম্যালেরিয়ার সব বংশধরেরা এমনই ভাবে বাসস্থান ও খাদ্য খুঁজে। সুবিধামত মানুষ কিংবা অন্য জন্তুর দেহ আশ্রয় করিয়া সংখ্যায় দ্রুত বাড়িয়া যায়। ইহাদের পরের ও পূর্বের ইতিহাস আমরা খুব বেশী জানি না। কিন্তু বাতাস বা জল বা খাদ্য যে ইহাদের বাহক মাত্র, ইহা এখন গৃহীত বিশ্বাস। কাজেই সিদ্ধান্ত করিতে হয়, জীবন-হীন জড় হইতে জীবনের আবির্ভাব হয় না; জীবন হইতেই জীবনের উৎপত্তি হয়। জীবনেরই একটা স্তরে পরিস্ফুট মন দেখা যায়, সুতরাং মনের আবির্ভাব জীবনের উপর নির্ভর করে, জড়ের উপর নয়।

একদিকে জড় আর একদিকে জীবন ও মন, এই উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধটা কি, তাহার স্পষ্ট উত্তর দেওয়া এখনও বিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। জীবিত দেহকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া যে সব দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহাদের উপাদান জড়জগতে রহিয়াছে, ইহা ঠিক; রসায়ন যে সব উপাদান জগতে দেখে, তাহাদেরই কতকগুলি জীবিত দেহেও বর্তমান থাকে। এই সম্পর্ক স্পষ্ট। আর, জীবন ও মন জড় দেহের আশ্রয় ছাড়া থাকে না এবং কাজ করে না, ইহাও স্পষ্ট। জড় জগতের একাংশে জীবন ও জীবিত জগতের একাংশে মন দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাও স্বীকার্য। জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, একটী পদার্থ হইতে আর একটী পদার্থ উৎপন্ন হয়; বাষ্প জল হয়, তরল কঠিন হয়, দানা বাঁধে, এমন ত সর্বদাই আমাদের চোখে পড়ে। জীবন ও মনের স্থিতি ও বৃদ্ধিও আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু উহাদের প্রথম আবির্ভাবের রহস্য এখনও উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। যে সব রাসায়নিক উপাদান দ্বারা জীবিত দেহ নির্মিত হয়, সে সকলের দ্বারা ল্যাবরেটারীতে

এখনও জীবন উৎপাদন করা সম্ভব হয় নাই, সেইটী না হওয়া পর্যন্ত এই রহস্য অনুদ্‌ঘাটিতই থাকিয়া যাইবে; এবং ইহার অবগুণ্ঠন ভেদ করিবার জন্য আমাদিগকে ভবিষ্যৎ আবিষ্কারের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইবে।

তারপর, আরও একটা কথা আছে, সেটী মানুষের জীবনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। মানুষ কতকাল এই পৃথিবীতে থাকিবে? কতকাল সে এই পৃথিবীর অধীশ্বর থাকিবে এবং আর কত কালই বা আদৌ জীবন ধারণ করিতে পারিবে? মানুষের দেহের বর্তমান যে গঠন, তাহা আর কতকাল এইভাবে থাকিবে? যদি দেহের পরিবর্তন হয় তবে সেটীই বা কি প্রকারে হইবে? ভাল না মন্দ? তাহা কি জীবনের বৃদ্ধি করিবে, না আশু ধ্বংস আনিবে? নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, শারীরতত্ত্ব এবং ক্রমবিকাশ, আর, পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়ন ইত্যাদি বিজ্ঞানের সাহায্যে দর্শন এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিতেছে। মানুষের ব্যাধি আছে—এক রকম নয়, বহুবিধ ব্যাধি আছে; আবার নূতন নূতন ব্যাধির আবির্ভাবও হয়। তারপর, তাহার বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু আছে। এই সমস্তই তাহার ধ্বংসের সম্ভাবনা বুকে ধরিয়া রহিয়াছে। মানুষ কি এ সমস্তকে আয়ত্ত করিয়া দীর্ঘ ভবিষ্যৎকে আপন করিয়া লইতে পারিবে? 'মারণ'-অস্ত্রের আবিষ্কার সে যতটা করিয়াছে, নিজের দেহতত্ত্বের উন্নতি করিতে পারে, এমন আবিষ্কার ততটা মানুষ করে নাই। এই সত্যের ভিতরও ধ্বংসের বীজ রহিয়াছে। অকাল মৃত্যু জীবজগৎ হইতে মানুষের সমাজে বেশী; ইহাও একটী ভয়ের কথা। তার উপর, মানুষে মানুষে—সাদায় সাদায় এবং সাদায় কালোয় ঝগড়া ত লাগিয়াই আছে। এ সকলেরই বা শেষ পরিণতি কি হইবে?

সুতরাং জীবনের প্রথম আবির্ভাবের প্রশ্ন যেমন রহস্যাবৃত,

তেমনই জীবনের শ্রেষ্ঠ বিকাশ মানুষের জীবনের ভবিষ্যতের প্রশ্নও রহস্যাবৃত। ইহা ছাড়া, দৈহিক মৃত্যুর পর মানুষের আবারও একটা জীবন আছে কি না, ইহাও একটা প্রশ্ন। প্রাচীন এবং প্রবল ও ব্যাপক বিশ্বাস বলে, মানুষের সেরূপ একটা জীবন আছে। কিন্তু অন্য জন্তুর হয় ত উহা নাই। বিজ্ঞান একথা অস্বীকার করিতে চায় আর প্রাচীন দর্শন উহা প্রমাণ করিতে চায়। দর্শন বলিতে চায়, মানুষের আত্মা অমর; সুতরাং দেহ না থাকিলেও বাঁচে; আর, বিজ্ঞান বলিতে চায়, তথাকথিত নিম্নজাতীয় কোন কোন প্রাণীর দেহ অমর; উহা ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া এক হইতে বহু হয়; সুতরাং উহার বরং একপ্রকার অমরত্ব আছে। তবে, উহার আত্মার বালাই নাই। কিন্তু মানুষের আত্মা দেহ হইতে পৃথক্ এবং দেহ ছাড়াও বাঁচিতে পারে, এরূপ প্রমাণ বিজ্ঞান পায় না। এই ভাবে জীবন, মানুষের জীবন, জীবনের ভবিষ্যৎ, জীবনে মৃত্যুর স্থান ও ক্রিয়া, ইত্যাদি লইয়া পাশ্চাত্য চিন্তা ব্যস্ত রহিয়াছে। প্রশ্ন বহু আছে; এবং উত্তরের চেষ্টাও বহু হইয়াছে; কিন্তু সে সকলের বিবরণ দেওয়ার মত স্থান এখানে আমাদের নাই। *

## (১৬) মানুষ

মানুষকে যন্ত্রের সামিল করিবার একটা রেওয়াজ আধুনিক দর্শনে দেখা দিয়াছে সে কথা আমরা বলিয়াছি। ইহার ফলে মনোবিদ্যা

* দ্রষ্টব্য (1) Broad—"Mind and its place in nature"
(2) Metchnikoff—"Nature of Man"
(3) Darwin—"Origin of Species"
(4) Huxley, Tyndall, ইত্যাদির লেখা ;
(5) Geddes and Thomson—"Evolution" ইত্যাদি

শারীরবিদ্যার শাখায় পরিণত হইতে চায়; এবং মনের ক্রিয়ার অর্থ স্নায়ু, শিরা, পেশীর ক্রিয়া মাত্র, এই একটা মতও দেখা দিয়াছে। আর, জীববিদ্যা পদার্থবিদ্যার অঙ্গ হইয়া মানুষের ও অন্যান্য প্রাণীর জীবনটাকে—আরম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত—একটা যন্ত্রের ক্রিয়ার মত দেখিতে চায়। এই রীতি সফল হইয়াছে বলিয়া দর্শন এখনও স্বীকার করে না। প্রথম, স্নায়ু শিরার উত্তেজনা বুঝা কঠিন না হইলেও তাহা আর জ্ঞান, অনুভূতি, স্মৃতি, মেধা, স্নেহ, মমতা, সুখ, দুঃখ, এই সব এক,—এইরূপ মনে করা সহজ নয়। দ্বিতীয়ত, মানুষের ও জীবের কোন কোন আচরণ বাহির হইতে দেখিলে যন্ত্রের ব্যবহারের মত দেখাইলেও জীবনের আবির্ভাব, বিকাশ, স্ফূর্তি ও মৃত্যু সবই যন্ত্রের সাহায্যে বুঝা যায় না। যন্ত্র আহার গ্রহণ করে না, উদ্ভিদ্, প্রাণী ও মানুষ করে; যন্ত্র বৃদ্ধি পায় না, জীবেরা পায়; একটী যন্ত্র আর একটী অনুরূপ যন্ত্রের জন্ম দিতে পারে না; জীবেরা পারে; আর যন্ত্রের ধ্বংস আছে, ভাঙ্গিয়া যায়; কিন্তু মরে না; জীবের মরণ আছে। ভাঙ্গিয়া যাওয়া আর মরিয়া যাওয়া এক নয়। সুতরাং এই সব দিক দিয়া মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করা সফল হয় নাই।

চারিত্রনীতিতে কথাটা আর এক রকমে উঠিয়াছে। জগৎ যদি যন্ত্র হয়, তাহা হইলে এই জগতের অংশ হিসাবে মানুষের কি কোন স্বাতন্ত্র্য থাকিতে পারে? তাহার কি ইচ্ছার বা কার্যের কোন স্বাধীনতা আছে? কার্য তাহাকে জগতের নিয়ম অনুসারেই করিতে হয়, সেখানে তাহার ত স্বাতন্ত্র্যের অবকাশ নাই; জল ঢালিয়া দিয়া সে উহাকে উপর দিকে চলিতে আদেশ দিতে পারে না—দিলেও রাজা কেনুউটের আদেশের মত তাহা পালিত হইবে না; ঢিল ছুড়িয়া সেটীকে মিত্র ডিঙ্গাইয়া শত্রুর গায়ে ফেলান কঠিন; প্রকৃতির নিয়মে যেখানে পড়িবে, রাসই-

খানেই উহা পড়িবে। সুতরাং কার্যে মানুষ প্রকৃতির নিয়মের অধীন, স্বাধীন নয়। ইচ্ছা কি তাহার স্বাধীন? কথাটা লইয়া অনেক তর্ক হইয়াছে। কিন্তু মীমাংসা কি? একই অবস্থাতেও সকলের ইচ্ছা এক-রকম হয় না; ক্ষুধা পাইলে সকলেই ঠিক একই বস্তু খাইতে চায় না। এসব জানা কথা। একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে, যে জন্য এইরূপ প্রভেদ হয়। কেহ বলেন মানুষ অবস্থার দাস; এখানেও নানা মুনির নানা মত দেখা গিয়াছে। কেহ চুরি করে, কেহ করে না কেন? অবস্থার দরুণ; অর্থের সচ্ছলতা, শিক্ষা, বংশমর্যাদা ইত্যাদি যাহার আছে সে চোর হয় না; এসবের অভাবই মানুষকে চোর করে। সমাজে সমস্ত পাপাচার এইরূপ অবস্থা-প্রসূত। ব্যক্তির স্বাধীনতা নাই। এই মতটা খুব প্রবলভাবে কিছুদিন প্রচারিত হইয়াছে।

কিন্তু ইহার অসুবিধা এই যে, ইহাতে কোন অপরাধের জন্য অপরাধীকে সাজা দেওয়ার কোন যুক্তি থাকে না। চুরি বা খুন যে করে, তাহাকে ফৌজদারী আদালতে না দিয়া পাগলাগারদে অথবা কোন আশ্রমে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। তাহার চিকিৎসা অথবা যত্ন দরকার, সাজা নয়। এইটি সমাজের পক্ষে অসুবিধাজনক হইতে পারে; চিকিৎসা করা কিংবা যত্ন দ্বারা অভদ্রকে ভদ্র অথবা অসাধুকে সাধু করা অপেক্ষা তাহাকে জেলে পুরিয়া রাখা সহজ। কিন্তু তথাপি এই মতও প্রচারিত হইয়াছে।

ইহা অপেক্ষা আর একটা বড় অসুবিধা এই যে, আমরা ইচ্ছা করিবার সময় অনুভব করি যে আমরা স্বাধীন। ইহাকে অপ্রমাণ করা কঠিন। সুতরাং মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। জগতের যান্ত্রিক নিয়ম আর মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা—একই বিশ্বে উভয়ের অবস্থিতি কি করিয়া সম্ভব, তাহা লইয়াও তুমুল তর্ক হইয়াছে। মীমাংসা হইয়াছে

কিনা বলা কঠিন। কেহ কেহ এই ব্যাপারটাকে একটা গভীর রহস্যও বলিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে মানুষের ধারণার বেলায় ইহা একটি বড় প্রশ্ন, এইটুকু জানাই আমাদের পক্ষে এখানে যথেষ্ট। আরও আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে মানুষকে যন্ত্রের সামিল করা এখনও দর্শনে সর্ববাদি-সম্মত রীতি বলিয়া গৃহীত হয় নাই।

একটা কথা আছে যে, মানুষের প্রধান বিচার্য বিষয় মানুষ নিজে। * দর্শনে এই কথাটী প্রায় সব যুগেই অনুসৃত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে 'আত্মানং বিদ্ধি'—নিজেকে জান, এই উপদেশ উপনিষদে কতরকমে দেওয়া হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীসেও অনুরূপ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। আধুনিক যুগের পাশ্চাত্ত্য দর্শনেও উপদেশটী বিস্মৃত হয় নাই। কখনও কখনও বিজ্ঞানের সাফল্যে বাহ্য প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব লাভ করিয়া মানুষ আত্মবিস্মৃত হইয়া জড় প্রকৃতিকে বড় করিয়া দেখিয়াছে হয়ত ; ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে ১৮শ শতাব্দীতে বাহ্য প্রকৃতির এই সমাদর অত্যন্ত প্রকট হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি মানুষ একেবারে বিস্মৃত হয় নাই। এই নবীন যুগের দর্শনের আরম্ভে ১৭শ শতাব্দীতে কথাটা উঠিয়াছিল যে, সবকিছু অবিশ্বাস করিলেও—ঈশ্বর, ধর্ম, বেদ, বাইবেল, কোরাণ, জীব ও জগৎ—সমস্তে আস্থা হারাইলেও অবিশ্বাসী নিজেকে অবিশ্বাস করিতে পারিবে না। চিন্তা করি—সুতরাং আমি আছি। এইভাবে আপন অস্তিত্ব সকলের আগে এবং সকলের চেয়ে সহজে প্রমাণিত হইয়া যায়। এই প্রমাণিত আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া পরে জগতে ও ঈশ্বরে বিশ্বাস পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায়। মানুষই এই চিন্তাধারার কেন্দ্র।

সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্য দর্শন নানাভাবে মানুষের কথা ভাবিয়াছে। সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব,

* "The proper study of mankind is man"—Pope.

এমন কি শারীরবিদ্যা ও মনোবিদ্যায়ও মানুষেরই কথা প্রধানত ভাবা হয়। দর্শনের ভাবা একটু অন্যরকমের। দর্শনে তাহাকে প্রধানত মন বা আত্মা হিসাবে বিচার করা হয়—দেহের গঠন, সামাজিক আচার ইত্যাদির দিক দিয়া নয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের কথাও দর্শন ভাবে—উহাদের নিজস্ব বিজ্ঞানও ভাবে। কিন্তু দর্শন উহাদের কথা ভাবে প্রধানত আত্মার ক্রিয়া ও বিকাশের ক্ষেত্র হিসাবে। কাজেই উভয়ত্র বিচারে পার্থক্য আছে। দর্শনের এই নবীনযুগে মানুষকে যতরকম চিন্তা করা হইয়াছে তাহার কয়েকটী নমুনা মাত্র আমরা এখানে উপস্থিত করিব।

( ১ ) বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বে * বলা আছে যে ঈশ্বর জগতের উপর কর্তৃত্ব দিয়াই মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই হইতে এইটী খ্রীষ্টান জগতের একটা প্রবল বিশ্বাস যে, মানুষই এই জগতের কেন্দ্র ; তাহার ভোগের জন্যই সমস্ত জগৎ ; এবং তাহার সুখ-দুঃখ, উপকার-অনুপকার দ্বারাই বিশ্বের সামগ্রীর মূল্য নিরূপিত হইবে। এমন কি ঈশ্বরের সৃষ্টিতে কোথাও ত্রুটি আছে কিনা, এই প্রশ্নেরও মীমাংসা হইয়াছে মানুষের সুখ সুবিধার মাপ-কাঠি দ্বারা। সৃষ্টির ভিতর কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে কিনা, থাকিলে সে উদ্দেশ্য কতটুকু সফল হইয়াছে,—এই ধরণের সকল প্রশ্নের বিচার হইয়াছে—মানুষকে মানদণ্ড করিয়া। এই চিন্তাধারা এখনও পরিত্যক্ত হইয়াছে বলা যায় না। তবে, ইদানীং দূরবীণের সাহায্যে বিশ্বের বিস্তৃতির সীমাহীনতা জানিতে পারিয়া মানুষ কতকটা নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করিতেছে এবং তাহারই জন্য এত বড় বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে ভাবিতে একটু লজ্জা বোধ করিতেছে। রেল স্টেশনের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া গাড়ী আসিতে দেখিয়া শিশুর মত কেহ ত

* Genesis i, 26., &c

ভাবে না, গাড়ী তাহারই জন্য আসিতেছে; তেমনই অনন্ত বিশ্বের এক কোণে বসিয়া মানুষও আজ ভাবিতে সঙ্কোচ বোধ করে যে এই বিশ্ব তাহারই জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল।

(২) আর একটা পুরাণ কথা পাশ্চাত্ত্য দর্শনে অনেক কাল চলিয়া আসিয়াছে যে, মানুষই সব জিনিসের পরিমাপ। * কথাটা প্রাচীনকালে গ্রীসে প্রথম উঠে। তারপর কিছুদিন কথাটার উপর তেমন জোর দেওয়া হয় নাই। কিন্তু অল্পদিন হইল আমেরিকাতে উইলিয়ম্ জেমস্ (Wm. James—১৮৪২—১৯১০) এই মতটাকে আবার পুনরুজ্জীবিত করেন। আমরা সাধারণত ধরিয়া লই—জগৎ এক, সত্য এক ও সনাতন; মানুষ কোন উপায়ে তাহা জানে। কিন্তু কথাটা কি সত্য? খাইতে বসিয়াছি; পাতে তরকারী পড়িল; একজন বলিল 'ভীষণ ঝাল'; আর একজন হয়ত বলিবে, 'কোথায় ঝাল'? দুইটী বিরুদ্ধ মত; সত্য কোনটী? আমরা জানি দুই-ই সত্য; যাহার ঝাল লাগিতেছে, তাহার সত্যই ঝাল লাগিতেছে; আর, যাহার ঝাল খাওয়া অভ্যাস আছে, তাহার ঝাল লাগিতেছে না, ইহাও সত্য। একজন নারীটীকে দেখিয়া বলিলেন, "পরমা সুন্দরী, উর্বশী"। অন্য জন হয়ত বলিবে,—'কি যে ফ্যাকাসে রং; পাট কাঠির মত শরীর; কি বিশ্রী'! কোন্‌টী সত্য? যে পাটকাঠি দেখিয়াছে, সে না হয় পাণিগ্রহণ না করুক, কিন্তু যে উর্বশী পাইয়াছে, সে ত তাহাকে বর্জন করিতে চাহিবে না। শুধু তরকারী আর নারীর বেলায় নয়; জগতের সকল দ্রব্যের বেলায়ই এক এক জন এক এক রূপ দেখে। গোটা জগৎটা সম্বন্ধেও ঐ কথা সত্য। কাহারও কাছে ইহার চেয়ে সুন্দর জগৎ আর হইতে পারে না; আর কেহ বলিবে, এ জগৎ বাসের

* "Man is the measure of all things."

উপযুক্ত নয়। কেহই কাহারও অভিজ্ঞতা ও সিদ্ধান্তকে অসত্য প্রমাণ করিতে পারিবে না। তাহা হইলে আমাদের কি সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত? সকলের অনুভূতি যখন এক নয়, তখন জোর করিয়া জগৎ এক বলার কি সার্থকতা আছে? যত জীব, তত জগৎ। আর যে যে রকম দেখে ও ভাবে, তাহার জগৎ তাহাই। এক ও সনাতন বিশ্ব আদর্শ অথবা কল্পনামাত্র। সত্য? যাহা মানিলে আমার জীবন-যাত্রায় অসুবিধা হয় না এবং যাহা না মানিলে আমাকে অসুবিধায় পড়িতে হয়, আমার সত্য উহাই; আর, তোমার সত্য তুমিও তোমার জীবনের সুবিধা অসুবিধা দিয়া স্থির করিও। ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলে তোমার সুবিধা হয়, করিও; তোমার জন্য ঈশ্বর আছেন; আমার ঈশ্বর না থাকিলে কোন অসুবিধা বোধ হয় না, সুতরাং আমার নাই। বহু দেবতা, এক ঈশ্বর প্রভৃতি সম্বন্ধে ঐ একই মীমাংসা। জীব সত্য; জীবন সত্য; বাকী সব ইহাদের প্রয়োজন সিদ্ধির সহায় হইলে সত্য, না হইলে অসত্য। এই মত অনুসারে সত্যের সত্যতা তাহার ক্রিয়া-কারিত্বের উপর নির্ভর করে। যদিও আমরা বেশী নামকরণের পক্ষপাতী নই, তথাপি এই মতকে ইংরেজীতে যে নাম দেওয়া হয়, * তাহার অনুবাদে 'ক্রিয়াকারিত্ববাদ' শব্দটী ব্যবহার করা যাইতে পারে মনে করি।

দর্শন? কত দর্শন ত জগতে আসিয়াছে। কেন? সত্য এক হইলে এতগুলি দর্শন কেন? আয়ুর্বেদে বায়ু, পিত্ত, কফ অনুসারে মানব প্রকৃতি ত্রিধা বিভক্ত হইয়াছে। আয়ুর্বেদ পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা নয়। কিন্তু বায়ু-পিত্ত-কফ—ধাতুগত বৈষম্য, সেখানেও আছে; প্রতীচীতেও ত মানুষের সকলের ধাতু এক রকম নয়—মেজাজ

* Pragmatism

এক নয়, দৃষ্টি-ভঙ্গি এক নয়; কাহারও হৃদয় কুসুম কোমল, কাহারও বজ্র-কঠোর; সেই জন্য এক এক জন সত্যকে এক একরূপ দেখিয়াছে, সেই জন্যই বিভিন্ন শ্রেণীর দর্শন হইয়াছে। সমস্তই মানুষের মাপে সত্য অথবা অসত্য হয়। সকলের উপর মানুষ সত্য। পাশ্চাত্ত্য দর্শন মানুষকে এই একভাবে দেখিয়াছে।

(৩) আর একটা মত প্রকাশ পাইয়াছে জার্মন দার্শনিক কাণ্টের চিন্তায়। তাঁহার মতে মানুষ হওয়াই মানুষের পরমার্থ; * তাহার চরম পরিণতি সে নিজে; কোন উচ্চতর উদ্দেশ্যের উপায় সে নয়। কথাটার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। মানুষ চিত্তের, মনের এবং দেহের কতকগুলি সম্ভাবনা লইয়া জন্মগ্রহণ করে। অনাহারে বা অল্পাহারে বাধা না পাইলে দেহে যাহা হওয়ার তাহা সে হয়; যতটুকু বলবান্ বা দীর্ঘ বা পুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা তাহার থাকে ততটুকু সে হয়। ইহা অবশ্যই সাধারণ সত্য। প্রতিপ্রসবের অস্তিত্ব আমরা অস্বীকার করিতেছি না। তথাপি সাধারণভাবে দেহের পরিণতি কদাচিৎ বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু মন ও চিত্তের গতি কি বাধাপ্রাপ্ত হয় না? সকলে সমান শিক্ষার সুবিধা পায় না, চরিত্র গঠনের সুবিধা পায় না; অথবা অনেক ক্ষেত্রেই নিজের শক্তি অন্যের উপকারে প্রয়োজিত করে। ধনিকেরা শ্রমিকদিগকে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের পরিশ্রমের ফল আত্মসাৎ করে, এ কথা ত আমরা এখন পথেঘাটে শুনি। কিছুকাল আগে সভ্য ইউরোপে ও আমেরিকায় এবং এখনও হয়ত জগতের অনেক স্থানে গো-মহিষের মত দাসরূপে মানুষের ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে ও হইতেছে। কাণ্টের সময়েও উহা চলিতেছিল। এইরূপ রাজ্যে শাসনশক্তি শ্রেণীবিশেষকে বঞ্চিত করিয়া তাহারই শক্তিতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে,

* Man is an end unto himself.

ইহাও ত ইতিহাসের পুরাতন কথা। এইভাবে রাষ্ট্রে বা অর্থনীতির ক্ষেত্রে মানুষ অপর মানুষকে পূর্ণতা প্রাপ্তির সুবিধা না দিয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধির উপায় স্বরূপ ব্যবহার করে; ইহা ত দেখা যায়। নেপোলিয়ান বা হিটলার, রোমের বা ইংরেজের সাম্রাজ্য কতকগুলি লোককে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়াই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এখনও থাকে। যে সব মানুষকে এইভাবে ব্যবহার করা হয়—সৈনিকরূপে বা অন্য-প্রকারে—, তাহারাও মানুষ হিসাবে নিজের পরমার্থ নিজে; অথচ তাহা হইতে না পারিয়া অন্যের স্বার্থসিদ্ধির উপায়রূপে ব্যবহৃত হয়। এইরূপ ব্যবহার যে করে এবং যে এইভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহারা উভয়েই মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করে। মনুষ্যত্বের যথার্থ মূল্য তাহারা দেয় না; এবং সেই পরিমাণে নীতিধর্মের কাছে তাহারা অপরাধী। মানুষের মর্যাদা এখানে উপেক্ষিত হয়। রাষ্ট্র, সমাজ, এমন কি গৃহ, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপায় মাত্র। এই বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে যে রাষ্ট্র বা সমাজ, তাহার কোন নৈতিক মূল্য নাই। সমাজে যে মানুষ পরস্পরের সহিত সম্পৃক্ত হইয়া বাস করে, উহাতে পরস্পরেরই সহায়তা হয়। কিন্তু সব সময়ে মনে রাখা উচিত, সমাজে বা রাষ্ট্রে কোন ব্যক্তিই শুধু উপায় নয়; সকলেই স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য বা পরমার্থ। প্রত্যেকের নিঃশ্রেয়স লাভের সহায়তা করে বলিয়াই—রাজ্য রাজ্য হয়; কিন্তু উহা উপায় ও উপেয়ের সম্মিলিত রাজ্য নয়; উহাতে প্রত্যেক ব্যক্তিই উপেয়; কেহ কাহারও উপায় স্বরূপ ব্যবহৃত হওয়ার জন্য সৃষ্ট হয় নাই।

এইভাবে সমাজ কল্পিত হইলে তাহাতে ব্যক্তির প্রকৃত স্থান কি হইবে, এক কথায় তাহার উত্তর দেওয়া যায় না। প্রচুর তর্ক ও বিচারের অবকাশ এখানে রহিয়াছে; এবং তর্ক-বিচার হইয়াছেও বহু।

আমাদের পক্ষে ইহা জানাই যথেষ্ট যে, মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, এই কথা বলিয়া মানুষকে একটা অনন্যসাধারণ মর্যাদা এখানে দেওয়া হইয়াছে।

(৪) মানুষকে একহিসাবে ইহারও চেয়ে বেশী মর্যাদা দিয়াছেন ফরাসী দার্শনিক কোঁৎ ( Auguste Comte—১৭৯৮-১৮৫৭ )। ইহার দর্শন শুধু দর্শন নয়; উহা একাধারে সমাজতত্ত্ব, শিক্ষা, ধর্ম ও দর্শন। মানুষের সমগ্র জ্ঞানকে একীকৃত ও সমন্বিত করিয়া তাহার সমগ্র ও বহুধা অভিব্যক্ত জীবনে তাহা প্রয়োগ করিলে যাহা হয়, কোঁৎ-এর দর্শন ঠিক তাহাই। ১৯শ-২০শ শতাব্দীতে অনেকেই তাঁহার শিক্ষা জীবনে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; ইংলেণ্ডে, আমেরিকায়, এমন কি, বাংলা দেশেও অনেকে তাঁহার নামের সঙ্গে যুক্ত সম্প্রদায়ের ভক্ত হইয়াছিলেন। এমনও শুনা যায় * যে, এই বাংলা দেশেও নাকি অনেকে তাঁহার গ্রন্থের কতক অংশ ভক্তি সহকারে প্রতিদিন অধ্যয়ন করিতেন; গীতা ও ভাগবত ইত্যাদি যেমন অনেকে পড়েন, ঠিক তেমনই; এবং ঐ গ্রন্থের কতক অংশ না পড়িয়া ঘুমাইতে পারিতেন না। কোঁৎ-এর জীবনটাও একটু অদ্ভুত ধরণের। তিনি পাপের পথেও অসংযতভাবে বিচরণ করিয়াছেন, পরে পুণ্যের পথেও ফিরিয়া আসিয়াছেন। এবং সর্বশেষে দর্শনের সাহায্যে একটা নূতন ধর্ম আবিষ্কার করিয়া শান্তি পাইয়াছেন। সে সকল বলিবার স্থান আমাদের নাই।

কোঁৎ-এর এই দর্শন-ধর্মের যে নাম দেওয়া হইয়াছে † তাহাকে

* পুরাতন প্রসঙ্গ—বিপিনবিহারী গুপ্ত প্রণীত, ( ১ম পর্যায় )
ইংরাজীতে এই দর্শনের ভাষ্যকারদের মধ্যে Frederick Harrison প্রসিদ্ধ।

† 'Positivism'

বাংলায় আমরা 'যাথার্থ্যবাদ' বলিতে পারি। কেহ কেহ ইহাকে 'ধ্রুব দর্শন' নাম দিতে চাহিয়াছেন। নাম উহাকে যাহাই দেই না কেন, উহার ভিতর তুইটি কথা আমাদের বিশেষরূপে অনুধাবন-যোগ্য।

(ক) তিনি মানুষের চিন্তার ইতিহাসে তিনটী স্তর দেখিয়াছিলেন। প্রথম মানুষ জগৎ বুঝিতে গিয়া দেবতার কল্পনার আশ্রয় লয়। গ্রীসে হোমারের যুগে, ভারতে বৈদিক যুগে, এই বিশ্ব মানুষের কাছে দেবময় ছিল। আকাশের বজ্র, ইন্দ্রের বজ্র, সমুদ্রের জল বরুণ-দেবতার শাসন মানে; এই প্রকার সব কল্পনার সাহায্যে জগৎটা বুঝিবার চেষ্টা মানুষ করিয়াছে। এইটী চিন্তার প্রথম স্তর। তারপর, দেবতার বদলে সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় সত্তা কল্পনা করিয়া দৃশ্যমান জগতের অর্থ মানুষ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে। দর্শনে তাহাই করা হয়। সাংখ্যের প্রকৃতি, বেদান্তের ব্রহ্ম, স্পাইনোজার পরম পদার্থ, ইত্যাদি অতীন্দ্রিয় বস্তুর কল্পনা জগৎ বুঝিবার জন্যই করা হইয়াছিল। কিন্তু এই সব অতীন্দ্রিয় বস্তু ত অভিজ্ঞতায় আসে না; কল্পনার সাহায্যে ভাবিয়া লইতে হয়। এইটী চিন্তার দ্বিতীয় স্তর। এই উভয় ক্ষেত্রেই মানুষ যাহা দেখে শোনে—যাহা জানে—তাহার অতিরিক্ত একটা সত্তা কল্পনা করিয়া লয়। কিন্তু ইহার কোন প্রয়োজন আছে কি? যাহা জানি, যাহা অভিজ্ঞতায় আসে, তাহাকেই যথেষ্ট মনে করিলে চলে ন? বিজ্ঞান ত তাহাই করে। সুতরাং অতিপ্রাকৃত কিছুর কথা না ভাবিয়া মানুষের চিন্তা যথার্থ জ্ঞানে সীমাবদ্ধ রাখাই উচিত। ১৯শ শতাব্দীতে বিজ্ঞান তাহাই করিতে চাহিয়াছে। ইহা চিন্তার শেষ সিঁড়ি।

(খ) দেবগণ, ঈশ্বর এবং এইরূপ সব অতীন্দ্রিয়, অতিপ্রাকৃত

পদার্থ বাতিল করিয়া দিলে আমরা যে জগৎ পাই, তাহাতে সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু কি? মানুষ। মানুষ সত্য এবং শ্রেষ্ঠ; উপাসনা যদি করিতে হয়, তবে মানুষই উপাস্য। এইটী কোঁৎ-এর দ্বিতীয় প্রধান উক্তি। ধর্ম ছাড়া মানুষের চলে না; উপাসনারও একটা সার্থকতা আছে; ইহা দ্বারাই জগতের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ স্ফুট ও সমঞ্জস হয়; জীবনে সুখ ও শান্তি সম্ভব হয়। সুতরাং ধর্ম বর্জনের উপদেশ দেওয়া চলে না। কিন্তু পুরাতন সব ধর্মেই অবাস্তবতার স্পর্শ রহিয়াছে; সেগুলি আর এই বিজ্ঞানের যুগে চলিতে পারে না, জগতে যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ, যাহার স্পর্শে জগৎ সুন্দর ও সুঠাম হয়, সেই মানুষ অপেক্ষা উপাস্য হওয়ার যোগ্য আর কি বা কে আছে?

ইহা গুরু-করণের বিধি নহে। কোন একজন মানুষ বাছিয়া লইয়া তাহাকেই 'ঠাকুর' বলিয়া পূজা করার উপদেশ ইহা নহে। ইহা ব্যক্তিবিশেষের পূজার উপদেশও নহে। যীশু কিংবা মহম্মদ, বুদ্ধ কিংবা চৈতন্যের পূজার কথাও নহে। যে মানব-জাতির মধ্যে বুদ্ধ-চৈতন্য বা যীশু-মহম্মদের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে, সেই সমগ্র জাতিই পূজার যোগ্য। দেশ বা সময় বা বর্ণের প্রশ্ন তুলিতে হইবে না। গ্রীসে, মিশরে, আরবে, ভারতে, ইউরোপে ও আমেরিকায়—মানব-জাতির মধ্যে কত মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন। যোদ্ধা, বৈজ্ঞানিক, কবি ও দার্শনিক—কতভাবে মানবত্বের বিকাশ আমরা দেখিতে পাইতেছি। যে মানবত্বের অনন্ত উদ্যানে এত সব মহা মূল্যবান্ জীবনপ্রসূন প্রস্ফুটিত হইয়াছে, সেই মানবতা কি পূজার অযোগ্য? দেশ-কাল-নির্বিশেষে, জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতিই মানবের উপাস্য। 'মহামানবের

সাগরতীরে' দাঁড়াইয়া দুই বাহু বাড়াইয়া এই নরদেবতারেই নমস্কার করা আমাদের উচিত। *

এই উপাসনা পদ্ধতিকে একটা প্রকট রূপ দিতে গিয়া বার ও মাসের নাম বদলাইয়া সর্বদেশের মহাপুরুষের নাম দ্বারা ইহাদের পুনর্বার নামকরণ পর্যন্ত হইয়াছিল। কোঁৎ বছরে ১৩টী মাস এবং প্রতিমাসে ২৮টী দিন ধরিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। মাস ও দিন গুলির নূতন নাম সব মহাপুরুষদের নামে করার আদেশ ছিল। মাসের নামে মুসা, আরিস্ততল, প্রভৃতি, আর দিনের নামে মনু, মহম্মদ, সেক্সপীয়ার, কলম্বস্ ইত্যাদির নাম লওয়ার কথা ছিল। আর, বৎসরের একটী দিনে জগতের সব মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনের উপদেশও ছিল। ২৮ দিনের ১৩ মাসের পর বৎসরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে একটী দিন অবশিষ্ট থাকিত; সেই দিনেই সকল মৃতদের শ্রাদ্ধের উপদেশ ছিল। এই সকলের বিস্তৃত বিবরণ এখানে অবান্তর। মুখ্য কথা এই যে, এই মানবতার ধর্মে সবের উপরে মানুষ সত্য, এই কথাটি ঘোষিত হইয়াছে। এইটী পাশ্চাত্ত্য দর্শনে মানুষ সম্বন্ধে আর একটী ধারণা।

---

* তুং—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ভারততীর্থ" :—

"হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে
জাগো রে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের
সাগর তীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু-বাহু বাড়ায়ে
নমি নর-দেবতারে,
উদারছন্দে পরমানন্দে
বন্দন করি তাঁরে।"

এই ধারণায় ব্যক্তি অপেক্ষা জাতির কথাটাই বেশী বড়। যে জাতিতে এতসব মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে আশা করা যায়, সেই জাতিই নমস্য। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সেই মহামানবতার বিশিষ্ট প্রকাশ বলিয়া তাঁহারাও নমস্য, সন্দেহ নাই; কিন্তু ঢেউয়ের চেয়ে জল বড়; জলকে যেখানে পূজা করিতে বলা হইতেছে, সেখানে ঢেউকে বাদ দিয়া নয়, আর ঢেউকে পৃথক্ করিয়াও নয়। মহাপুরুষেরা মানব-সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত ঢেউ মাত্র।

(৫) ইহা হইতে একটু পৃথক্ ধরণের চিন্তা পাই জার্মন দার্শনিক নীট্‌চের ( Nietzsche ) দর্শনে (১৮৪৪-১৯০০)। সব মানুষ যে সমান নয়, ইহা এত সত্য যে ইহার উল্লেখ করারও প্রয়োজন হয় না। মানবতার স্রোত মাঝে মাঝে অতিমানব বহন করিয়া আনে; কখনও কখনও এমন সব মহাপুরুষ আবির্ভূত হন, যাঁহাদের সমান পাওয়া যায় না। বুদ্ধ, যীশু, শেক্‌স্‌পীয়র, মহম্মদ প্রভৃতি এই শ্রেণীর অতিমানব। "বীর ও বীরপূজা" * নামক গ্রন্থে কার্লাইল ( Thomas Carlyle—১৭৯৫—১৮৮১) কথাটা বেশ জোরের সহিত বলেন। অতিমানবের কল্পনার ইহা পূর্বাভাস। প্রশ্ন উঠে, এই সব অতি-মানবের মূল্য যদি বেশী হয়, তবে, মানবতার প্রবাহটাকেই শুধু বড় করিয়া দেখার কি মানে? মানবজাতির অস্তিত্বই জগতের একমাত্র সার্থকতা নয়; তাহার উন্নতিও হওয়া দরকার। সাধারণ মানুষের পরিবর্তে অতিমানবের আবির্ভাবও প্রয়োজন। জগতের ও মানবজাতির সার্থকতা এই অতিমানবের আগমনে সহায়তা করা।

---

* "Heroes and Hero-worship".

এই অতিমানবের কল্পনা সাহিত্যেও প্রবেশ করিয়াছে। বার্ণার্ড শ' (এখনও জীবিত) এই অতিমানবের কল্পনাটাকে একটা রূপ দিয়াছেন; কি ভাবে সমাজ, পরিবার, বিবাহ-পদ্ধতি প্রভৃতি পরিচালিত হইলে অতিমানবের আবির্ভাব সম্ভব হয়, সে কথা কতক উপহাস, কতক উপদেশ ছলে আলোচিত হইতেছে। প্রশ্নটা এখন আর ষোল আনাই দর্শনের প্রশ্ন নহে; আর, এই সব সাহিত্য এত সহজলভ্য যে আর বিস্তৃত আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

(৬) মানুষের কথা দর্শনে চিন্তিত হইয়াছে, দুইভাবে; কখনও ব্যস্তভাবে ব্যক্তির, আবার কখনও সমস্তভাবে জাতির কথাটা বড় হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা অতিমানবের কথা ভাবিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে বিশিষ্ট ব্যক্তির মূল্যই বেশী—যেমন নীট্‌চের চিন্তায়। আবার যাঁহারা সমষ্টির বা জাতির কথা ভাবিয়াছেন, যেমন কোঁৎ, তাঁহাদের বেলায় ব্যক্তি অপেক্ষা জাতি বড়। এইভাবে সমষ্টির কথা আরও অনেকে চিন্তা করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই ঠিক দর্শন-ব্যবসায়ী না হইলেও তাঁহাদের চিন্তা দর্শনের আসরে আসন পাইতে পারে। যাঁহারা সর্ব-সময়ের সর্ব মানবের ইতিহাস ভাবিয়াছেন, তাঁহারা এই শ্রেণীর ভাবুক। * এই সব আলোচনার মধ্যে একটা প্রধান কথা এই যে, মানুষ চিরকাল উত্তর-বংশীয়দের জন্য 'আত্মবলিদান' করিয়া আসিতেছে। ইতিহাসের ইহাই সাক্ষ্য। একটা প্রাচীন জাতিকে পরাজিত করিয়া নূতন জাতি উন্নত হয়—একটা প্রাচীন সভ্যতার সমাধির উপর একটা নূতনের আবির্ভাব হয়; যেমন

---

* দ্রষ্টব্য—Winwood Reade—"The Martyrdom of Man"; Oswald Spengler—'The Decline of the West"; ইত্যাদি গ্রন্থ।

গ্রীসের ধ্বংসের উপর রোম গড়িয়া উঠিয়াছিল; ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের উপর ইংরেজের সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সমস্তের ভিতর একদিকে ধ্বংস আর একদিকে নূতনের উদ্ভাবন, দুই-ই রহিয়াছে। প্রাচীন নিহত হয়—নিজেকে বলি দেয়, নবীনের আগমনের পথ সুগম করিবার জন্য। ইহাতে ভীত কিংবা দুঃখিত হইবার কিছু নাই; ইহাই ইতিহাসের ধারা। অতীতের বহু শত জাতির শ্মশানের উপর বহুশত সভ্যতার ভস্মরাশির সাহায্যে আধুনিক মানবমণ্ডলী ও তাহার সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্বের জাতিরা—প্রাচীন মানবেরা—আত্মবলি দিয়াছিল বলিয়াই আধুনিকের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে। তাহারা ইচ্ছায় আত্মবলি দিয়াছিল, এমন নয়; সংগ্রামে পরাজিত হইয়াই বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি তাহারা শহীদ; তাহারা মরিয়াছে বলিয়াই আমরা জন্মিয়াছি।

আবার, ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া মনে রাখা উচিত যে, আমাদিগকেও শহীদ হইতে হইবে। ইচ্ছায় নয়; নূতনের আগমনে বাধা আমরা দিব হয়ত; কিন্তু অতীতের আলোচনা হইতে ইতিহাসের যে নিয়ম জানিতে পারিয়াছি, তাহা সত্য হইলে পরাজয়ও আমাদের নিশ্চিত। কারণ, নূতন আসিবেই; আর, আমাদের সমাধি এবং সমাপ্তি হইবে তাহার আরম্ভ।

এইভাবে যুগে যুগে মানুষ নিজেকে বলি দিয়া ভবিষ্যতের দিকে জাতিকে আগাইয়া দিতেছে। সুতরাং বর্তমানে সভ্যতার সৌধে কোথাও যদি ভাঙন ধরিয়া থাকে, তবে তাহাতে দার্শনিকের ভীত হওয়া উচিত নয়; উহা নূতন ভবিষ্যতের আগমনের সূচনা মাত্র। যদি দেখি, ঈশ্বর অবিশ্বসিত, ধর্ম পরিত্যক্ত, অর্থ উপাসিত, হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা ও লোভ প্রবল, তবে, তাহাতেও আমাদের ভীত হওয়া উচিত নয়;

এমন আরও হইয়াছে। এ সকলের এইমাত্র অর্থ যে, নূতন আসিতেছে। বাড়ীর লোককে কর্মব্যস্ত দেখিলে কাহারও মরণ যেমন আশঙ্কা করা যাইতে পারে, তেমনই নূতন শিশুর জন্মও ত কল্পনা করা যাইতে পারে। বৃদ্ধ যখন নাতির কোলে মাথা রাখিয়া মৃত্যুবরণ করে, তখন তেমন দুঃখ করার কি থাকে? তেমনই নবীনের অরুণ উদয় দেখিয়া স্তূপীকৃত অতীতের সঙ্গে বর্তমান পশ্চিমে হেলিয়া পড়িবে, ইহা স্বভাবের নিয়ম, ইহা ইতিহাসের ধারা, ইহাই মানবত্বের চিরন্তন গতি ও স্ফূর্তি। পর পর মানব সমাজের এইরূপ আত্মবলির উপরই মানব সভ্যতার অবিরাম গতি নির্ভর করিয়া আসিতেছে।

যুদ্ধকে আমরা ভয় পাই; কিন্তু মানুষের ইতিহাস যুদ্ধেরই ইতিহাস নয় কি? যুদ্ধে ক্ষতি হয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার ধ্বংসস্তূপ হইতে নবীনের আবির্ভাবও হয়; কেহ পরাজিত হয়, হয়ত একেবারে বিলুপ্ত হয়; কিন্তু সেই লোপ সমগ্র মানবজাতির বা মানব সভ্যতার লোপ নয়; বরং উহার অগ্রগমন। রোমের কাছে গ্রীস, বর্বরদের কাছে রোম পরাজিত হইয়াছিল; পরবর্তী ইতিহাস ভাবিলে কি সেগুলি দুর্ঘটনা বলিয়া মনে হইবে? তেমনই ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, তারপর যাহা আসিবে তাহা—সবই কি শুধু দেশের দুর্ভাগ্য? যাঁহারা উন্নততর ভবিষ্যতে আস্থা রাখেন তাঁহাদের উচিত বর্তমানের বিলয়ে ভীত না হইয়া বরং উহাতে সহায়তা করা; বর্তমানের ভাঙন দেখিলে অধিকতর মঙ্গলের আশায় উৎফুল্ল হওয়া। বর্তমানে যে সমাজ, জাতি বা সভ্যতা শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করে, তাহার শ্রেষ্ঠত্বের দাবী হয়ত অচিরেই লোপ পাইবে। তাহাতে তাহার মনে কষ্ট হইতে পারে; কিন্তু সমগ্র মানবজাতির আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই; কারণ, এই ধ্বংসের

সঙ্গে সঙ্গেই নূতনের নির্মাণ আরম্ভ হইবে; নূতন কোন জাতি বা সমাজ হয়ত শ্রেষ্ঠ হইয়া যাইবে; হয়ত শ্বেতজাতির পর অ-শ্বেত কোন জাতি বড় হইয়া উঠিবে। উহা সমগ্র হিসাবে মানবজাতির অমঙ্গল কিছুই নয়; মানবজাতি এইভাবেই ক্রমশ সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

উপরের এই কয়টী দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যাইবে, মানুষের কথা কতরকমে পাশ্চাত্ত্য দর্শনে চিন্তিত হইয়া আসিতেছে।

## (১৭) মানুষ ও তাহার জগৎ

চারিদিকে যে বিরাট বিশ্ব রহিয়াছে তাহার তুলনায় মানুষ যে কত ক্ষুদ্র, তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। কিন্তু তবু মানুষ এক হিসাবে এই বিশ্ব হইতে বড়; সে উহাকে জানে, উহার কথা ভাবিতে পারে, উহার প্রকট শক্তি সকল নিজের প্রয়োজনে নিয়োজিত করে; উহার অপ্রকট শক্তি আবিষ্কার করিয়া তাহাকেও ব্যবহার করিতে চায়। এই সব দেখিয়া অতি আদিম কাল হইতেই মানুষ নিজেকে সৃষ্টির অধিস্বামী মনে করিয়া আসিয়াছে; স্রষ্টা নিজে তাহাকে এই অধিকার দিয়াছেন, ইহাও সে ভাবিয়াছে।

কিন্তু প্রশ্ন উঠিয়াছে, বাস্তবিকই কি বিশ্ব মানুষের খুব বন্ধু? মানুষের কাজে কি সহস্র বাধা সে সৃষ্টি করে না? নিসর্গের নিয়মে ব্যাধি ও মরণ আসে; উহারা মানুষের চিরশত্রু। তারপর, সামান্য একখানা বাগান করা হইতে আরম্ভ করিয়া সভ্যতার সৃষ্টি,—প্রায় পদে পদেই কি মানুষকে বিশ্বের প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হয় না? একখানা বাগান করিতে প্রত্যেকটী সযত্ন-পোষিত বৃক্ষ

ও লতাকে প্রকৃতির পোকা, আগাছা, ইত্যাদির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে মানুষকে কি কম পরিশ্রম করিতে হয়? তারপর, মানুষ গ্রাম ও নগর নির্মাণ করে—শ্রম ও সময় যথেষ্ট ব্যয়িত হয়; কিন্তু একদিনের ভূমিকম্পেই হয়ত তাহা ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া যায়, আর চিহ্নও থাকে না। এমন ত ইতিহাসে অনেক হইয়াছে। কত গ্রাম ও নগর পৃথিবীর গর্ভে বিলীন হইয়াছে। সকলের কথা ত ইতিহাস জানেও না।

কিন্তু সকলের অপেক্ষা বিশ্বের এই বিরোধিতা প্রকাশ পায় মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির বেলায়। বিশ্ব-প্রকৃতি মানুষের চিত্তে যে সকল প্রবৃত্তি রোপণ করিয়াছে,—তাহাদিগকে দমন করাই কি কম আয়াস-সাধ্য? অথচ, তাহাদিগকে দমন না করিলে মানুষের উন্নতি হয় না। কাম, ক্রোধ ইত্যাদির প্রয়োজনও আছে; কিন্তু তাহাদিগকে সংযত ও শিক্ষিত করিয়া মানুষ নিশ্চিন্ত হইতে পারে না; যে কোন সময়ে তাহারা আবার বিদ্রোহী হইতে পারে। একবার ক্রোধ দমন করিয়াছি বলিয়াই আর একবার ক্রোধ আমার হইবে না, এমন নয়। সুতরাং যে চিত্ত দমন আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য মানুষের প্রয়োজন, তাহা করিতে মানুষকে অবিরত প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হয়।

আরও আছে। একজন কোথাও ধার্মিক বা চরিত্রবান্ হইলেই তাহার বংশে সকলেই পর পর ক্রমশ ধার্মিক হইয়া ত যায় না। বরং তাহার বিপরীতটাই বেশী দেখা যায়। একবার ক্রোধ দমন করিলেই যেমন আমার চিরকালের জন্য ক্রোধ দমন করা হইয়া যায় না, তেমনই একজন পুণ্যবান্ হইলেই তাহার পরবর্তী বংশে সমস্তই পুণ্যবান্ হয় না, পাপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতে চায়।

এই সব দেখিয়া কি মনে হয়? পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি মানুষের খুব বন্ধু নয়, এই সিদ্ধান্তই মনে আসে না কি? তাই যদি হয়, বিশ্ব যদি মানুষের বিরোধী হয়, তবে, কত কাল এই শত্রুব্যূহের মধ্যে সে তার আদর্শ রক্ষা করিতে পারিবে? কতকাল আত্মরক্ষাই বা করিতে পারিবে?

বাহিরের প্রকৃতি হিংস্র; সেখানে রক্তাক্ত নখ-দন্তের ক্রিয়া আমরা সর্বদা দেখিতে পাই। তাহাকে নীতিধর্মে শিক্ষিত করিয়া সভ্য ভব্য করিয়া তোলা কি সম্ভব? আর মানুষের ভিতরের প্রকৃতি—তাহার প্রবৃত্তি সকলও কি সহজেই শান্তদান্ত হইয়া যাইবে? শাস্ত্র, শাসন ও শিক্ষার সাহায্যে ত মানুষ কতকাল যাবৎ সে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। ফল কি হইয়াছে? যে বংশে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, সে বংশেও ত উত্তরকালে পাষণ্ডের আবির্ভাব অসম্ভব নয়। চরিত্রের লব্ধ উন্নতি ও পরিমার্জিত রূপ ত বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হইয়া যায় না। তবে, মানুষের ভরসার কথা কোথায়?

ঊনবিংশ শতাব্দী আশাবাদের শতাব্দী ছিল। অনেকে সাহিত্যে ও দর্শনে—এই আশাই প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, সাময়িক ব্যর্থতার ভিতর দিয়াও মানুষ অন্তিমে নীতি ও ধর্মকে জয়ী করিতে পারিবে। এমন কি, বাহ্যপ্রকৃতিও একদিন মানুষের চরম বশে আসিবে।

এই আশার বিরুদ্ধ কথাও ছিল। সেটী বর্তমানে আরও প্রকট হইয়াছে। অন্তিম অবনতি এবং হয়ত বিলোপ, মানুষের অনিবার্য, ইহাও আজ আমরা শুনিতেছি।

কেহ কেহ আবার মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়া বলেন, খেলার যেমন চূড়ান্ত জয়-পরাজয়টাই বড় কথা নয়, খেলাটাই প্রধান, তেমনই প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম যদি চিরকালও চলে,

তবে তাহাতেই এমন ভীত হওয়ার কি কথা? মানুষ বাগান করে; সে জানে প্রকৃতিতে বাগানের শত্রু আছে; তবুও ত সে বাগান করে এবং শত্রুর সঙ্গে অনবরত লড়াই করিয়াও উহাকে রক্ষা করে। তাহার নীতিধর্মকেও তেমনই বাগানের মতই সে যত দিন পারে রক্ষা করিবে। সংগ্রাম সে করিয়া যাইবে; প্রকৃতির বিরুদ্ধ আচরণে সে পশ্চাৎপদ হইবে না। আর যদি হয়ই, তখন নীতি-ধর্মের সৌধ ভাঙ্গিয়া পড়িবে। হয়ত মানুষও লোপ পাইবে কিন্তু আপাতত এই সংগ্রামের বিরতিও দেখা যায় না, চূড়ান্ত জয়েরও কোন আশা নাই।

এই বিংশ শতাব্দীর পরপর দুইটী জগৎ-ব্যাপী মহাসমরের পরেও মানুষ জগৎ-রাজ্য ও বিশ্ব-শান্তির কথা ভাবে ও বলে। সুতরাং অমিত্র শক্তি বাহিরে রহিয়াছে বলিয়াই মানুষ একেবারে নিরাশ হইয়া গাণ্ডীব ত্যাগ করিয়া বসিয়া পড়িবে, এমন ত মনে হয় না। *

## (১৮) দেশ ও কাল †

বাহ্য জগতের চিন্তা করিতে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন হয় দেশ ও কাল। কোনও একটা বস্তুর কথা ভাবিতে 'উহা অমুক জায়গায় আছে' এই ভাবে আমরা চিন্তা করি; আর, কোনও একটা ঘটনার কথা চিন্তা করিতে 'উহা অমুক সময়ে ঘটিয়াছিল' এইরূপ

---

* দ্রষ্টব্য:—Huxley—'Evolution and Ethics', ইত্যাদি।

† দ্রষ্টব্য:—(1) Alexander—"Space, Time and Deity"
(2) Eddington—"The Expanding Universe"
(3) Jeans—"The Mysterious Universe"

মনে করি। দেশ, দিক্ বা আকাশ বলিতে আমরা একটা বিস্তৃতি বুঝি যাহা জগতের সমস্ত বস্তু-জগতের আশ্রয় বা অধিকরণ। ক্ষুদ্র কৃমি-কীট হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবী, চন্দ্র, সৌরমণ্ডল, অনন্ত নক্ষত্ররাশি—সমস্তই আকাশে অবস্থিতি করে। সাধারণভাবে সমস্ত দ্রব্যের আশ্রয়কেই আমরা আকাশ বলি। এই আকাশকে আবার পূর্ব, পশ্চিম, ঊর্ধ্ব, অধঃ এবং ঈশান, বায়ু প্রভৃতি কোণে বিভক্ত করিলে 'দশ দিক্' পাওয়া যায়। দশ দিকে বিভাজ্য যাহা তাহাই দেশ বা আকাশ। সুতরাং দিক্, দেশ ও আকাশ এই শব্দ কয়টি একার্থে ব্যবহার করিলে বুঝিতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

এই দিক্, দেশ বা আকাশ ছাড়া জগতের চিন্তা করিতে আমাদের আরও একটী পদার্থের প্রয়োজন হয়, সেটী কাল। কালের অনুভূতির লক্ষণ হইতেছে পূর্ব-পর জ্ঞান। ইহা শুধু বাহ্য জগতের জ্ঞানেই প্রয়োজন হয়, এমন নয়; আমাদের ভিতরকার অভিজ্ঞতার কথা ভাবিতেও আমরা কাল-পরম্পরা না আনিয়া পারি না। 'ছিল', 'আছে', 'আসিবে'—এই ভাবেই আমরা আমাদের সমস্ত সুখ-দুঃখ, জ্ঞান ও স্মৃতি এবং অনুভূতি ও কল্পনার প্রবাহ রচনা করিয়া লই। বাহিরের জগতেও যাহা ঘটে, শুধু স্থিতিমান নয়, তাহার চিন্তায় একটা পরম্পরা—একটা আগে-পরে জ্ঞান—আসিয়া পড়ে। মাথাটা ধরা ছিল, এখন আরামবোধ হইতেছে; আকাশে মেঘ রহিয়াছে,

(4) Westlake—"3000 years of Quest".

(5) H. G. Wells—"The Time Machine".

(6) U. C. Bhattacharjee—"Space, Time and Brahma" in the Jha Commemoration Volume, Oriental Book Agency, Poona. &c, &c.

আরও বৃষ্টি হইবে ;—এইত আমাদের ভাবিবার পদ্ধতি। বাহ্য এবং আন্তর ঘটনা-প্রবাহকে আমরা এইভাবে ত্রি-কালে—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এইভাবে—চিন্তা করি। শীত গিয়াছে, গ্রীষ্ম আসিয়াছে, বর্ষা আসিতেছে ; শৈশব পার হইয়াছি, যৌবনও যায় যায় ; বার্দ্ধক্যের স্পর্শ হইতে উহার ভবিষ্যৎ আগমন সূচিত হইতেছে। কালের যে তিনটী ভাগ আছে, তাহা ব্যাকরণে ক্রিয়াপদ সাধিতে আরম্ভ করিয়া শিশুরাও জানিয়া ফেলে।

আকাশ এবং ত্রিধা বিভাজ্য কাল এই উভয়কেই সাধারণ মানুষ অনাদি ও অনন্ত বলিয়া জানে। সাধারণ বিশ্বাস অনুসারে ইহাদের আরম্ভও নাই, শেষও নাই।

অন্তরের অভিজ্ঞতা এবং বাহ্য জগতের বস্তু ও ঘটনাবলী—কিছুই যখন আমরা দেশ ও কাল ছাড়া ভাবিতে পারি না, তখন এই দুইটি পদার্থের চিন্তা নানাভাবে দর্শনে প্রবেশ করিয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য। ভারতের এবং ভারতের বাহিরের দর্শনে ইহাদের কথা নানাভাবে চিন্তিত হইয়াছে ; এবং আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দর্শনে এই চিন্তা একটা বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে।

ইহার জন্য দর্শন বিজ্ঞানের নিকট ঋণী। গত আড়াই হাজার বৎসর যাবৎ ইউরোপের চিন্তা ইউক্লিডের জ্যামিতিকে অভ্রান্ত মনে করিয়া আসিতেছিল ; গত অর্ধ শতাব্দীর বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কার ও সিদ্ধান্ত সেই বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। বিন্দু, সরল রেখা, কোণ সমতল প্রভৃতি যে সব ধারণা আমাদের দিক্ ও দেশের গণনায় প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার প্রায় সবগুলি সম্বন্ধেই নূতন কথা আধুনিক চিন্তায় প্রকাশ পাইয়াছে। এ সকলের ফলে দেশ বা আকাশের ধারণা পরিবর্তিত হইয়াছে। পৃথিবীটা যে চ্যাপটা, ইহাই শিশুরা

প্রথম ভাবে; কিন্তু পরে কয়েক বৎসরের মধ্যে স্কুলে ঢুকিয়া শিখে, পৃথিবী কমলালেবুর মত গোল। কিন্তু যে আকাশে পৃথিবী প্রভৃতি সকলে ছড়ানো রহিয়াছে তাহার রূপ কেমন? এক সময়ে তাহাকেও মানুষ চ্যাপটা ভাবিত। কিন্তু সৌরমণ্ডলের গ্রহ ইত্যাদির উপবৃত্তের আকারে গতির কথা চিন্তা করিলে আকাশকে আর সমতল মনে করা যায় না। তবে আকাশকে কি ভাবে ভাবিব?

আকাশ গোল, এই একটা কথা আজকাল কেহ কেহ বলিতেছেন। অর্থাৎ অগণিত তারকারাশি ও সৌরমণ্ডল বুকে লইয়া যে বিশ্ব রহিয়াছে, উহা একটী ফুটবলের মত গোল। একটা বড় ফুটবলের ভিতর নানা জায়গায় নানাপ্রকার রঙের কাচের টুকরা ঝুলাইয়া রাখিতে পারিলে বিশ্বের অনেকটা অনুকরণ হইত। আমরা ভূ-গোল ও খ-গোলের কথা কম-বেশী শুনি; সঙ্গে বিশ্ব-গোলের কথাটাও জুড়িয়া দেওয়া দরকার।

এই বিশ্ব-গোল অনন্ত কিনা সে প্রশ্নও উঠিয়াছে। সাধারণ মানুষ আমরা আকাশের সীমা বা শেষ ভাবিতে পারি না। কিন্তু অসাধারণ কেহ কেহ তাহাও ভাবিয়াছেন। ইঁহারা আবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন যে, এই স-সীম বিশ্ব-গোল বা আকাশ ক্রমশ বড় হইতেছে —অধিক বিস্তৃত হইতেছে। এই স্ফীতি বা বিস্তৃতির প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টাও হইয়াছে। আকাশে স্থিত বিভিন্ন নক্ষত্রমণ্ডলীর পরস্পরের দূরত্ব—বিশেষত ছায়াপথের মত দূরের নক্ষত্ররাজির দূরত্ব নাকি বাড়িতেছে! অর্থাৎ উহারা ক্রমশ পরস্পর হইতে এবং পৃথিবী হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে। শক্তিশালী দূরবীক্ষণের সাহায্যে ধৃত আলোক-বিকিরণের ছবি হইতে উহা জানা যায়। সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হয়, স-সীম বিশ্ব-গোল ক্রমশ বৃদ্ধি লাভ করিতেছে—ক্রমশ বিস্তৃত

হইতেছে; ফুটবলের ভিতর হাওয়া পুরিলে উহা যেমন ক্রমশ অধিকতর স্ফীত হয়, ঠিক তেমনই।

এই সিদ্ধান্তে একটা অসুবিধা আছে। ফুটবলের স্ফীতি হয় তাহার বাহিরে যে জায়গা আছে—যে আকাশ আছে—সেখানে; কিন্তু বিশ্ব-গোল বা আকাশের বাহিরে ত আর কিছু নাই; তবে উহার স্ফীতি সম্ভব হয় কিরূপে? স্ফীতির কথা ভাবিতে গেলেই উহার বাহিরেও জায়গা আছে, ইহা ভাবিতে হয়; কিন্তু তাহা হইলে ত আর আকাশকে সসীম বলা চলে না। ইহার কি সমাধান? উত্তর, কোন কোন স্থলে কঠোর বিজ্ঞান এবং কোমল কাব্যেরও মিলন ঘটে; এই সিদ্ধান্ত বা কল্পনা তাহারই একটি দৃষ্টান্ত।

সসীম বস্তু কি অনাদি হইতে পারে? অন্তবান্ হইলেই আদিমান্ও হইতে হইবে, এমন ত নিয়ম নাই। সুতরাং আকাশ যদিই বা সসীম হয় এবং ফুটবলের মত ক্রমশ স্ফায়মান হয়, তথাপি ত উহা অনাদি—আরম্ভহীন—হইতে পারে। উহার সীমা আছে কিন্তু উহার আরম্ভ কখনও হয় নাই—উহা চিরন্তন—এরূপ চিন্তা করা যায়। দেশকে যাঁহারা সসীম ভাবিয়াছেন, তাঁহারাও উহাকে আদিমান্ মনে করিতে কুণ্ঠা বোধ করিয়াছেন।

সসীমই হউক আর অসীমই হউক, আকাশ অজর, অমর এবং অক্ষয়; সুতরাং জ্যামিতির সত্য সব চিরন্তন এবং সার্বত্রিক—সকল কালে এবং সকল স্থানে সত্য; ইহাই আমরা এতকাল মানিয়া আসিয়াছি। কিন্তু তাহা কি ঠিক? এই প্রশ্নও আজ উঠিয়াছে; এবং বহু জটিল যুক্তি-প্রমাণের পর সিদ্ধান্ত হইয়াছে, প্রাচীন ধর্মকেও যেমন আর রক্ষা করা চলে না, প্রাচীন জ্যামিতিকেও তেমনই আর বিশ্বাস করা যায় না। যে কোন ত্রিভুজের তিনটী কোণের সমষ্টি

দুইটী সমকোণের সমান, ইহা অসত্য নয়, কিন্তু সর্বত্র সত্যও নয়। এই সব সিদ্ধান্তের ফলে দেশ বা আকাশের ধারণাটা দর্শনে আজ এক অভিনব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

শুধু কি দেশ? কালেরও বেশ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কালের যে ধারণা সাধারণ মানুষের মনে আছে তাহাতে উহা একটা প্রবাহ—আদিহীন এবং অন্তহীন। ইহাতে বর্তমান নামক যে অংশ তাহাতে আমরা আছি, অতীত অতিক্রম করিয়াছি আর অনাগত ভবিষ্যৎ সম্মুখে রহিয়াছে। এই ভাবেই আমরা কালের কল্পনা করি। এ পর্যন্ত সহজ। কিন্তু কালের পরিমাণ ও বিভাগ যে সব আমরা করি, সে সব কি সনাতন এবং সার্বত্রিক? রাত্রি কি সব দেশেই রাত্রি? আগে জানিতাম না কিন্তু এখন ত আমরা জানি যে, পৃথিবীর সব দেশেই একই সময়ে রাত্রি নয়; কলিকাতায় যখন বেলা দুপুর, আমেরিকায় কোথাও তখন রাত দুপুর। সুতরাং দিবারাত্র প্রভৃতি বিভাগ সার্বত্রিক নয়। শীত-গ্রীষ্মও যে তাহা নয়, ইহাও এখন আমাদের কাছে সুস্পষ্ট। কিন্তু দিন-রাত্রির পরিমাণ? মাস ও বৎসরের পরিমাণ? যে কোন পঞ্জিকা-কার জানেন যে, সৌর মাস ও চান্দ্র মাস সমান নয়। তার উপর, পৃথিবীর একদিন আর বৃহস্পতি গ্রহের একদিন সমান নয়; উভয়ের বৎসরের পরিমাণও এক নয়। তাহাব কারণ, উভয়ে সূর্যের চারিদিকে সমান সময়ে ঘুরে না। এইখানেই শেষ নয়; অতীত অনাগতের প্রভেদও সনাতন এবং সার্বত্রিক নয়। সূর্য হইতে পৃথিবীতে আলো আসিতে কয়েক মিনিট লাগে। দূরের নক্ষত্রগুলি হইতে আলো আসিতে কয়েক কোটি বছর লাগে। এ সকল আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত। কালের কল্পনায় ইহাদের ফল কি? দূরের

একটা নক্ষত্রে যদি কোন ছেলে দেওয়ালির দিন একটা তারাবাতি জ্বালে, তবে সে আলোটা সেখানে বর্তমান; পৃথিবীতে দূর ভবিষ্যৎ; কয়েক হাজার বৎসর পরে—আরও কয়েকটা বিশ্ব-সমরের পরে—হয়ত আসিয়া পৌঁছিবে। লুব্ধক হইতে যে আলো-কণা কাল রওনা হইয়াছে, তাহা সেখানে অতীত, পথে কোথাও বর্তমান, আর আমাদের এখানে এখনও অনাগত। এইভাবে আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার আবিষ্কারের দরুণ কালের প্রাচীন কল্পনায় অনেক অদল-বদল ঘটিয়াছে। দার্শনিক চিন্তা এ সকলের প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইতে পারে না।

আরও একটা কথা। অতীত কাল কি একেবারে লুপ্ত? উহা কি কোথাও কোনও প্রকারে থাকে না? দেশের লয় নাই, ইহা আমরা জানি। আমরা একসঙ্গে সব জায়গায় থাকিতে পারি না; লণ্ডনে থাকি যে সময়ে, সে সময়ে কলিকাতায় অনুপস্থিত হই; কিন্তু আমি থাকি বা না থাকি, লণ্ডন, কলিকাতা, পৃথিবী, বৃহস্পতি, লুব্ধক ও ছায়াপথ এবং ইহাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত দেশ অক্ষয় ও অমর। দেশে আমরা পূর্ব হইতে পশ্চিমে অথবা উপর হইতে নীচে ভ্রমণ করিতে পারি; আমাদের গতির—সমস্ত বিশ্বের গতির—অধিকরণরূপে আকাশ বিস্তৃত হইয়া অ-বিকল পড়িয়া রহিয়াছে। দেশে মানুষের সৃষ্ট গ্রাম-নগর আর প্রকৃতির সৃষ্ট গ্রহ-উপগ্রহ-তারকা কখনও কোনও কারণে লোপ পাইলেও তাহাদের স্থান অবিকৃত থাকিয়া যায়। বোমায় লণ্ডন বিধ্বস্ত হইলেও লণ্ডনের স্থানটি রহিয়া গিয়াছে; একটা উল্কা বা নক্ষত্র নিবিয়া গেলেও তাহার স্থানটা লোপ পায় না। আর গ্রহেরা এখন আকাশের যে স্থানে আছে ঘুরিয়া আবার সেই স্থানে ফিরিয়া আসিতে পারিবে। কিন্তু কালের বেলায় কি বলিব? উহাতেও ঘটনা ঘটে;' ঘটনা ঘটিয়া গেলেই কালের স্রোত বহিয়া

যায়—বর্তমান অতীতে পরিণত হয়, আর ফিরে না, আর তাহাতে যাওয়া যায় না। তেমনই, ভবিষ্যৎ আসিবে, বর্তমান হইবে, তারপর অতীত হইয়া বিলীন হইয়া যাইবে। এই ত আমরা ভাবি; কিন্তু ইহাই কি ঠিক? যে কাল অতিক্রম করিয়াছি, তাহাতে কি আর ফিরিয়া যাওয়া যায় না? যে কাল আসে নাই, একটু আগাইয়া গিয়া কি তাহাতে প্রবেশ করা যায় না?

স্মৃতি এবং কল্পনার সাহায্যে আমরা অতীত এবং ভবিষ্যৎকে জানিতে পারি; কিন্তু ইহা ঠিক অভিজ্ঞতা নয়। যে শৈশব অতিক্রম করিয়াছি, তাহা গিয়াছে, আর ফিরিবে না; তাহার স্মৃতি মনে থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাকে আর পাওয়া যাইবে না। এই ত আমরা সাধারণত ভাবি। তেমনই, ভবিষ্যতে মৃত্যুর আগে কাশীবাস করিব ভাবিতে পারি, কল্পনা করিতে পারি; কিন্তু উহা অভিজ্ঞতা নয়, স্পষ্ট জ্ঞান নয়। জগতের অতীত কাহিনী ইতিহাস বলে, আমরা জানি; জগতের ভবিষ্যৎ কবি ও দার্শনিক কল্পনা করেন, অঙ্কিত করেন, আমরাও শুনি এবং চিন্তা করি; কিন্তু এই অতীত ও অনাগতের জ্ঞান ঠিক বর্তমানের জ্ঞানের মত নয়; একবার দেখা জায়গায় আবার ফিরিয়া যাওয়ার অথবা না-দেখা জায়গা দেখার মত নয়। এই ত কাল সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ বিশ্বাস। কিন্তু ইহাই কি শেষ কথা?

কেহ কেহ বলিয়াছেন, দেশের মত কালও চিরস্থায়ী; অতিক্রান্ত হয় কিন্তু বিলুপ্ত হয় না। চলিতে চলিতে কলিকাতা ছাড়িয়া কাশী যাইতে পারি, এবং আবার ফিরিয়া কলিকাতায় আসিতে পারি। দেশের সম্বন্ধে ইহা সন্দেহের বাহিরে। কালের বেলায়ও কেহ কেহ মনে করেন এইরূপে অতিক্রান্ত কালে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব; এবং ঠিক

অদৃষ্ট নূতন জায়গায় যেমন যাওয়া সম্ভব, অনাগত কালেও তেমনই প্রবেশ করা অসম্ভব নয়। অতীত লোপ পায় নাই; অতিক্রান্ত স্থানের মত অদৃশ্য হইয়াছে মাত্র। উপযুক্ত মানসিক শক্তি অর্জন করিতে পারিলে আবার মুর্শিদাবাদে সিরাজদ্দৌলার প্রাসাদে যাওয়া যায়;—পরিত্যক্ত জীর্ণ প্রাসাদে নয়; সিরাজদ্দৌলার সময়ের প্রাসাদে —তখনকার আবহাওয়া, আদব-কায়দা, চাকর-চাপরাসী—সমস্তের ভিতর যাওয়া যায়; শুধু স্মরণ ও কল্পনার সাহায্যে নয়, বাস্তবের সম্মুখীন অভিজ্ঞতা লইয়া এ সবকে আবার প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। প্রাসাদের জায়গাটা যেমন পড়িয়া রহিয়াছে—জীর্ণ কুঠরীগুলিও যেমন রহিয়াছে, দেখা যায়, ঘটনাগুলি এবং সেই সময়কার লোকগুলিও তেমনই কালে রহিয়াছে, তবে সাধারণ মানুষ দেখিতে পায় না, এই মাত্র প্রভেদ। একটু ধারণাশক্তি ও চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করিলেই ঐ সমস্তই কালের গর্ভে বিলীন নয়, কালের কুঠরিতে রক্ষিত অবস্থায় দেখা যাইতে পারে। কোনও একটা স্থান দেখিতে যেমন কম-বেশী দৈহিক পরিশ্রম করিতে হয়, অতীতকে প্রত্যক্ষ করিতেও তেমনই কিছু অতিরিক্ত মানসিক শ্রম স্বীকার করিতে হয়। ভার্সাইয়ে (Versailles) ষোড়শ লুইয়ের প্রাসাদ এবং সেই প্রাসাদের বাসিন্দাদিগকে কিছু দিন আগে একজন এইরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণনা পাওয়া যায়।

অতীতের সম্বন্ধে যাহা সত্য, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও তাহা সমান সত্য। উহাও আমার কাছে অনাগত হইলেও অজাত নয়; দূর দেশের মত দূরে অবস্থিত মাত্র। মনের শক্তি বৃদ্ধি পাইলে উহাও এখনই দৃষ্টি-পথে আসিতে পারে।

প্রাচীনদের মুখে আমরা ত্রি-কাল জ্ঞানের কথা শুনি। এতক্ষণ

যাহা বলা হইল তাহা স্বীকার করিলে এই ত্রি-কাল-দর্শন আর নিছক কবি-কল্পনা থাকিবে না। কাল সম্বন্ধে আধুনিক যুগের চিন্তাশীলেরা এমন সব কথা বলিয়াছেন যাহা সাধারণ জ্ঞান ও বিশ্বাসের অনেক উর্ধ্বে এবং যাহাতে বিজ্ঞান ও কাব্যের, কঠিন ও কোমলের—এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে ;

দেশ ও কাল উভয়ই অনাদি ; ইহাদের আরম্ভ আমরা চিন্তা করিতে পারি না। আর আকাশকে যদিও বা কেহ কেহ সসীম বলিয়াছেন, কাল সম্বন্ধে সেরূপ কথা বলা হয় নাই ; কালের শেষ অকল্পনীয়। এই যে অনাদি এবং অধিকাংশের মতে অনন্ত দেশ আর অনাদি ও অনন্ত কাল, এই উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক কি ? ইহারা কি পরস্পর-নিরপেক্ষ ? একটীকে কি আর একটী ছাড়া ভাবিতে পারি ?

একই মুহূর্ত্তে যে কোথাও রাত্রি কোথাও দিন, কোথাও শীত কোথাও গ্রীষ্ম, এবং আলোকরশ্মির ভ্রমণের মত একই ঘটনা যে কোথাও অতীত কোথাও ভবিষ্যৎ,—ইহা হইতে কি প্রতীয়মান হয় না যে কাল দেশ-নিরপেক্ষ নয় ? জায়গার সঙ্গে যুক্ত করিয়াই কালের রকম ও পরিমাণ বুঝিতে হইবে। দেশ ও কালের অস্তিত্ব পরস্পরের সহিত যুক্ত। দেশ-কালের এই যুক্ত অস্তিত্ব আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে গৃহীত দর্শনের একটী বিশিষ্ট অভিমত। ইহার সঙ্গে সম্পৃক্ত রহিয়াছে যাহাকে আমরা সাধারণত বলি আপেক্ষিকতা-বাদ। * 'ছোট', 'বড়' ইত্যাদি প্রভেদ তুলনা-মূলক সুতরাং আপেক্ষিক। হাতীর তুলনায় যে জন্তু ছোট, পিঁপড়ার তুলনায় সে খুবই বড়

---

* দ্রষ্টব্য—উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত "দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি" ( বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা, বিশ্বভারতী ), ৭৬ পৃঃ।

হইতে পারে। এইরূপ উত্তর-দাক্ষণ প্রভৃতি প্রভেদও আপেক্ষিক; কোন স্থানই সব জায়গার উত্তরে নয়; এক স্থানের উত্তরে হইয়াও অন্য স্থানের দক্ষিণে কিংবা পশ্চিমে হইতে পারে। 'ভারী', 'হালকা' প্রভৃতিরও চন্দ্রে এবং পৃথিবীতে এক অর্থ নয়। কালের গণনায়ও তেমনই একটা আপেক্ষিকতা আছে। ইহার দৈর্ঘ্য, রাত্রি-দিন প্রভৃতি প্রভেদ আপেক্ষিক; এবং এই আপেক্ষিকতা আসে কাল দেশের সহিত সংযুক্ত বলিয়া। দেশ বাদ দিয়া আমরা কালের কথা ভাবিতে পারি না এবং কাল ছাড়া দেশও চিন্তা করিতে পারি না। উহারা পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত।

এই যুক্ত-জীবন দেশ-কাল অনাদি এবং অসৃষ্ট এবং জগতের আদিম উপাদান। * মানুষের দেহ ও আত্মার মধ্যে যেমন সম্বন্ধ, দেশ-কালের সম্বন্ধও তাহাই। দেশ কালের দেহ অথবা বহিঃপ্রকাশ, আর কাল দেশের আত্মা বা অন্তঃশক্তি। এই দুই যুক্ত আদিম পদার্থ হইতেই সমগ্র বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, জড়, জীবন, মন—সমস্তেরই মূল উপাদান এই দুইটী।

এই বিবরণে দেশ ও কালকে বাহ্য বস্তু ধরা হইয়াছে। কিন্তু উহারা কি বাস্তবিকই তাই? কাণ্ট ভাবিতেন, দেশ ও কাল আমাদের বাহ্য অনুভূতির একটা পদ্ধতি মাত্র, বাস্তব সত্য নয়; মানস-চক্ষুর দুইটী চশমার মত, মনের বাহিরে কিছু নয়; এই দুইটী ছাড়া আমরা কিছু অনুভব করিতে পারি না, কিন্তু অনুভূত বাহ্য জগতে ইহাদের অস্তিত্ব নাই। কিন্তু এই মত বর্তমানে খুব প্রবল নয়। দেশ-কালের বাস্তবতার সম্পর্কে সন্দেহ বর্তমান চিন্তায় কম।

কাল ও দেশ সম্বন্ধে আধুনিক দর্শনে যে সব মত প্রচারিত

* দ্রষ্টব্য—পূর্বগত ১৩ অধ্যায় (৩)।

হইয়াছে, তাহাদের ভিত্তি বিজ্ঞানের অনেক সূক্ষ্ম যুক্তি ও আবিষ্কার। সে সকলের সংক্ষিপ্তভাবে অবতারণা করাও এখানে অসম্ভব। বিস্তৃত জ্ঞানের জন্য কেহ প্রলুব্ধ হইলে তাঁহাকে আকর-গ্রন্থে প্রবেশ করিতে হইবে।

## (১৯) রাষ্ট্র ও সমাজ

ভারতীয় চিন্তার সঙ্গে ইউরোপীয় চিন্তার একটা মস্ত প্রভেদ এই যে, ব্যক্তির জীবনের অপরিহার্য প্রতিবেশ হিসাবে রাষ্ট্র ও সমাজকে ইউরোপের চিন্তা কথনই একেবারে অসত্য বা বর্জনীয় মনে করে নাই; বরং ব্যক্তির আদর্শের মত রাষ্ট্র ও সমাজের আদর্শের কথাও পরিপূর্ণভাবে সেখানে বিবেচিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীসের প্ল্যাতো হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগের যে কোন দার্শনিকের নাম লই না কেন, রাষ্ট্র ও সমাজ কাহারও চিন্তা হইতে একেবারে বাহিরে থাকে নাই। মানুষের চিন্তা তাহার জীবনের ধারা—তাহার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিবেষ্টন পরিবর্তিত করিয়া দেয়, না, জীবন-ধারার পরিবর্তন এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন—চিন্তার বিপ্লব আনয়ন করে, ইহাও একটী ভাবিবার মত প্রশ্ন। এই উভয়ের সম্বন্ধ যে নিকট, তাহা স্বীকৃত; এবং উভয়ই উভয়কে পরিবর্তিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, ইহাও স্বীকার করা যায়। তাহা হইলেও প্রশ্নটী রহিয়াছে এবং প্রতীচী উহা ভাবিয়াছে। পাশ্চাত্ত্যের নূতন যুগ আরম্ভ হইতে এই বিষয়ে বিশেষভাবে মন দিয়াছেন ইংলণ্ডে হব্‌স্ (Hobbes), লক্ (Locke) প্রভৃতি এবং ফরাসী দেশে রুশো (Roússau) প্রভৃতি। সকলের নাম করা আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন;

কেন না, আমরা ব্যক্তিবিশেষের মত অপেক্ষা বিশিষ্ট চিন্তাধারার কথাই বেশী ভাবিব। এই সব বিষয়ে বিভিন্ন দার্শনিকের লেখা দ্বারা পুষ্ট হইয়া যে বিস্তৃত সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে কয়েকটী বিশিষ্ট ধারা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। আমাদের উচিত তাহাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় লাভ করা।

প্রথমত, রাষ্ট্র ও সমাজের প্রভেদটা মনে করিয়া লওয়া দরকার। রাষ্ট্র একটা কেন্দ্রীকৃত শক্তি যাহা সমাজে আইন প্রণয়ন করিয়া কর্তব্য নির্দেশ করিয়া দেয়, এবং সাধারণভাবে সমাজে লোকের জীবন ও ধন-সম্পত্তি রক্ষা করিয়া শৃঙ্খলা রক্ষা করে। এই রাষ্ট্রশক্তি বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন দেশে পৃথক্ পৃথক্ আকার ধারণ করিয়াছে। খুব প্রাচীন কালে রাজা শাসনযন্ত্রের কেন্দ্র ছিলেন; এবং তিনি উত্তরাধিকার সূত্রেই সাধারণত রাজা হইতেন। কেহ বা বলপ্রয়োগে রাজ্য স্থাপনও করিয়াছেন। তারপর আবার কিছুকাল উত্তরাধিকার অনুসারে পিতার রাজ্য পুত্র পাইয়াছে। বর্তমানে রাজা পৃথিবীতে খুব বেশী নাই—আঙ্গুলে গণিয়া লওয়া যায়; যাঁহারা আছেন, তাঁহাদেরও সিংহাসন যখন তখন কাঁপিয়া উঠে। কয়েক বৎসর আগে ইংরেজেরা একটী পূর্ববিবাহিত নারীকে ববাহ করার জন্য অষ্টম এডওয়ার্ডকে যে ভাবে সিংহাসন হইতে সরাইয়াছে, তাহা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আবার এই যে যুদ্ধ সেদিন শেষ হইল, ইহার পরে কোন কোন ক্ষুদ্র দেশে খুদে রাজার আবির্ভাবের কথাও মাঝে মাঝে শুনা যাইতেছে। তবে, মোটের উপর রাজার রাষ্ট্র অপেক্ষা রাজহীন রাষ্ট্রের সংখ্যাই বেশী। অর্থাৎ গণতন্ত্রই এখন রাষ্ট্রের সাধারণ রূপ। ইহার রূপের মধ্যেও অনেক বৈচিত্র্য আছে। রাষ্ট্রের মধ্যে আবার একটা কেন্দ্রীকৃত শাসনশক্তি থাকে; দেহেতে যেমন কর্মশক্তি,

ঠিক তেমনই। ইংরেজীতে ইহাকে 'গভর্ণমেণ্ট' বলা হয়। রাষ্ট্র কথাটা আরও বিস্তৃত ও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই গভর্ণমেণ্ট বা শাসনশক্তির রূপও সর্বত্র এক নয়। সে সব আলোচনা আমাদের এখানে দরকার নাই।

রাজার অধিকার সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি; তিনি ঈশ্বর-দত্ত অধিকারে শাসন করেন; তাঁহার আদেশ অমান্য করা সব সময়েই শুধু অপরাধ নয়, ধর্মে পাপ; ইত্যাদি কথাও এক সময় জগৎ শুনিয়াছে; এ দেশও শুনিয়াছে; 'অষ্টাভিশ্চ সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভি র্নির্মিতো নৃপঃ'—দেবগণের অংশে রাজা জন্ম নেন, এ সব কথা এ দেশও শুনিয়াছে। আবার রাজাকে সিংহাসনচ্যুত এ দেশেও করা হইয়াছে। ইউরোপেও তেমনই ঈশ্বর-দত্ত অধিকারের কথাটা এক সময় খুব প্রবল ছিল। কিন্তু ইংলণ্ডও ১৭শ শতাব্দীতে এক রাজার (১ম চার্লস) প্রাণদণ্ড দিয়াছে, ফরাসী দেশও তাহা ১৮শ শতাব্দীতে করিয়াছে (ষোড়শ লুই)। তাহার আগে 'আমিই রাষ্ট্র' এরূপ গর্বিত উক্তিও রাজাদের মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে (ফরাসী দেশের ১৪শ লুই)।

দ্বিতীয়ত, সমাজ রাষ্ট্র হইতে পৃথক্ জিনিস। কেন্দ্রীকৃত শাসন-শক্তি ছাড়া মানুষের যে সমষ্টি পরিবার, শ্রেণী ইত্যাদিতে বিভক্ত হইয়া অথচ পরস্পরের সহিত সম্পৃক্ত হইয়া বাস করে, তাহাকে আমরা সমাজ বলি। বর্তমানে রাষ্ট্র ছাড়া সমাজ নাই; আর, অতি আদিমকালেও মানুষের সভ্যতা যখন আসে নাই, শুধু দলবদ্ধ হইয়া মানুষ থাকিত, তখনও একজন দলপতি ছিল, যাহার আদেশ সকলেরই পালনীয় ছিল। তথাপি দলপতি, বা রাজা বা গণতন্ত্রের অধিনায়ককে কেন্দ্র করিয়া যে শাসন-শক্তি সমাজে আছে, তাহা

সমাজ হইতে পৃথক্, এরূপ ভাবা আমাদের উচিত। এই রাষ্ট্র ও সমাজ লইয়া যে সব প্রশ্ন উঠিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে এই :—

(১) রাজা, তাঁহার আবির্ভাব ও অধিকার।

(২) রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও শক্তি।

(৩) সমাজের উৎপত্তি, স্থিতি ও সার্থকতা।

(৪) ব্যক্তির স্বার্থ ও এই উভয়ের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক।

আমাদের দেশে রাজবংশের প্রাচীনতা বুঝাইবার জন্য চন্দ্র-সূর্যের নাম করা হয়। চন্দ্রবংশ ও সূর্যবংশের রাজারা এদেশে রাজত্ব করিয়াছেন। ইউরোপেও রাজবংশের প্রাচীনতা নানাভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু সেটা তত বড় প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন উঠে রাজা শাসন করিবার অধিকার পান কোথা হইতে? ঈশ্বর-দত্ত অধিকারে রাজা শাসন করেন, এই একটা মত ছিল। ধর্মের বেলায় যেমন, ধর্মপ্রতিষ্ঠান বা গীর্জার যাজকেরা ঈশ্বর-প্রদত্ত অধিকারে মানুষের আত্মার উপর আধিপত্য করিতেন এবং নিজেরা নির্ভুল, এই সব দাবীও পোপেরা করিতেন, রাজারাও এক সময় সে দাবী করিয়াছেন; কিন্তু যখন ধর্মের শাসন খুবই প্রবল ছিল, তখন রাজারাও সে শাসনের অধীন ছিলেন। ধর্মের আদেশে এক রাজা আর এক রাজার বিরুদ্ধে লড়াইও করিয়াছেন। ধর্ম রাজাকেও সমাজচ্যুত, এমনকি, সিংহাসনচ্যুতও করিতে পারিত। কিন্তু মধ্যযুগের অবসান ও লুথারের ধর্মসংস্কারের পর ধর্মের এই শাসন সংকুচিত হইয়া আসে। তখন রাজারাই ধর্মের রক্ষকত্বের দাবী করিতে থাকেন; ইংলণ্ডের রাজার পুরা উপাধিতে এখনও তাঁহাকে 'ধর্মের রক্ষক' ( Defender of the faith ) বলা হয়।

১৭শ-১৮শ শতাব্দীতে আবার প্রশ্ন উঠে, রাজাদের এসব শক্তি

ও অধিকারের মূল উৎস কোথায়? উত্তর হয়, সমাজে ব্যক্তিদের সম্মিলিত সম্মতির ফলে একটা চুক্তির মত হয় এবং সেই ভাবেই রাজশক্তি আবির্ভূত হয়। মানুষ শাসনের প্রয়োজন বুঝিয়াছিল। এই শাসন করিবার জন্য একজন মনোনীত হন। তিনিই হন রাজা। সমাজের ব্যক্তিদের সম্মতির সাহায্যেই তিনি শাসকের অধিকার পান। তবে কি, প্রজারা ইচ্ছা করিলে এবং প্রয়োজন বোধ করিলে রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিতে পারে?

এখানে দুইটী মত দেখা দেয়। কাহারও মতে, যদিও সমাজের লোকদের সম্মতির উপরই রাজত্বের প্রথম প্রতিষ্ঠা, তথাপি এই সম্মতি আর সমাজ ফিরাইয়া লইতে পারে না; সুতরাং রাজার শাসন করিবার অধিকার চিরস্থায়ী। আবার কাহারও মত এই হয় যে, যে অধিকার দান করিয়াছে, প্রয়োজন বোধ করিলে সে অধিকার সে কাড়িয়া লইতে পারে। কুশাসনের ইহাই প্রতিকার; কুশাসককে নিয়োগকর্তা অর্থাৎ সমাজ, বরখাস্ত করিতে পারে। ইংলণ্ডেও একবার এইরূপে রাজা বরখাস্ত হইয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন; ফরাসী দেশেও তাহাই। রাজার বিরুদ্ধে প্রজার চূড়ান্ত অধিকারের দাবী এই দুইটী বড় ঐতিহাসিক ঘটনায় স্বীকৃত হইয়া যায়। এই বিংশ শতাব্দীর ২য়-দশকে রুশিয়ায় জারের নিপাতেও প্রজাশক্তির আর একটা বিকাশ দেখা দিয়াছে।

রাজাই রাষ্ট্র নন। যে দেশে রাজা আছেন, সে দেশে তিনি রাষ্ট্র-শক্তির কেন্দ্র সন্দেহ নাই; কিন্তু রাজা ছাড়াও রাষ্ট্র হইতে পারে। ফরাসী দেশে ১৪শ লুইর মত গর্বিত রাজারা অবশ্যই ভাবিতেন, 'রাষ্ট্র? সে ত আমি!' কিন্তু এই গর্ব রাজাদের বেশীদিন টিঁকে নাই। "অতি দর্পে হতা লঙ্কা; অতি মানে চ কৌরবাঃ।" লঙ্কা ছাড়া আরও

অনেক রাজত্ব দর্পে হত হইয়াছে, কৌরবরা ছাড়াও অনেক রাজবংশ নির্মূল হইয়াছে। সর্বশেষ ও সর্বোপরি বৃহৎ রাজবংশ ধ্বংস হইয়াছে এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে (১৯১৭-১৮) রুশিয়ার জার-বংশ! কিন্তু রাজা গেলেও রাষ্ট্র থাকে, একটা শাসন-শক্তি থাকে, এমনকি রুশিয়াতেও এখনও আছে। এই রাষ্ট্র সম্বন্ধেও একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে; রাষ্ট্র ছাড়া কি সমাজ চলে না? একটা কেন্দ্রীয় শাসনশক্তি না হইলে কি আমাদের বাঁচা অসম্ভব? কি দরকার, পুলিশ, ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ, আদালত ইত্যাদির? কি দরকার সেনা, সেনাপতি, যুদ্ধ, বিদ্রোহ ইত্যাদির? প্রাচীন ভারতে এক একটী গ্রাম এক একটী ক্ষুদ্র সমাজ ছিল; তাহার জমি ছিল, চাষ হইত; ফসল সকলে মিলিয়া বাটিয়া খাইত। জলের যোগাড়ও ছিল। তরকারী, ফল ইত্যাদিও মিলিত। চুরি, ডাকাতি, মানুষের দেহের উপর ও সম্পত্তির উপর অত্যাচার কি হইত না? হইত; কিন্তু বিচারের জন্য আদালত ছিল না, ছিল পঞ্চায়েত। আর উকীল, ব্যারিস্টারের বালাই ছিল না; নিজেদের কথা নিজেরাই বলিত। বিচার হইত; শাস্তিও প্রয়োজন মত নানাবিধ হইত। সেই জীবনে কি আবার মানুষের সমাজ ফিরিয়া যাইতে পারে না? যদি যায়, তবে নীতি, ধর্ম ইত্যাদির বিশেষ হানি হইবে না। কিন্তু হানি হইবে বড় বড় কারখানার; সহরের উপকণ্ঠে যে হাজার হাজার শ্রমিক লইয়া বিরাট যন্ত্রদৈত্যের অধিষ্ঠান রহিয়াছে, সে সকল হয়ত থাকিবে না; আর থাকিবে না হয়ত বড় বড় অস্ত্রের কারখানা, মানোয়ার জাহাজ, বড় বড় বিমান এবং সর্বোপরি আণবিক বোমার গোপন কল! নাই বা থাকিল? তাতে কি মানুষের দুঃখ বাড়িবে, না সুখ?

বর্তমানে রাষ্ট্রের প্রধান কাজ আইন প্রণয়ন করা এবং এই আইন

যাহাতে অনুসৃত হয়, সেইজন্য ম্যাজিস্ট্রেট, বিচারক ও পুলিশ নিযুক্ত করা; আর, এই সমস্ত খরচ চালাইবার জন্য লোকের নিকট হইতে কর আদায় করা। এই সমস্ত কাজে গণতন্ত্রগুলি কতকটা লোকের মতও জানিয়া লয়; অন্যত্র প্রজাদের সঙ্গে পরামর্শ অল্পই হয়; আর সর্ব্বত্রই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রাষ্ট্রের শক্তি বা বলের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ইহার পরিবর্তে রাষ্ট্রকে কি একটা সমাজ-সেবার প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যায় না? সে সব প্রতিষ্ঠান লোকের স্বেচ্ছায় প্রদত্ত চাঁদার উপর নির্ভর করে, আর নিজেদের সাধ্যমত আর লোকের প্রয়োজনমত লোকের সেবা করে। এ সবের ভিতর বলপ্রয়োগের কথা কোথাও উঠে না। রাষ্ট্রও কি এইরূপ লোকের স্বাধীন ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত একটা সেবা সমিতিতে পরিণত হইয়া যাইতে পারে না?

এইসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলেই পরদিনই সব সহর ও সহরতলী খালি হইয়া যাইবে, কারখানার চিম্‌নীতে ধূঁয়া দেখা যাইবে না, ভদ্র, অভদ্র, মজুর ও বাবু সবে মিলিয়া গ্রামে গিয়া বসতি লইবে, গাইয়ের দুধ, পুকুরের মাছ, আর ক্ষেতের ধান ও বাগানের ফল খাইয়া সকলে 'অন্নদা-মঙ্গল' কিংবা 'খ্রীষ্টের অণুকরণ' * পাঠ করিবে আর আনন্দে জীবন কাটাইতে থাকিবে, এমন নয়! তবে, কথাটা ভাবিতে দোষ কি? পাশ্চাত্ত্য দর্শন এখনও ভাবে। আমাদের মধ্যেও মহাত্মা গান্ধী ভাবেন।

রাজা, রাষ্ট্র ও সমাজের উৎপত্তি সকল মানুষের একটা সম্মিলিত চুক্তি বা সম্মতি হইতে হইয়াছে, এই একটা মত পাশ্চাত্ত্য দর্শনে অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়—১৭শ-১৮শ শতাব্দীতে। এই চুক্তি-বাদের সঙ্গে আরও একটা প্রশ্নও জড়িত আছে। সমাজের আবির্ভাবের

* 'Imitation of Christ' by Thomas 'a Kempis'

পূর্বে মানুষের কি অবস্থা ছিল? একটা কথা সোজা; তখন মানুষ প্রকৃতির সন্তান, প্রকৃতির কোলে ছিল। কিন্তু কেমন ছিল? সেটা কি সুখের, আনন্দের অবস্থা ছিল, না, তাহার বিপরীত?

সকলের সম্মতি হইতে সমাজের উৎপত্তি যাঁহারা মানিয়াছেন, তাঁহারাও মানুষের প্রকৃত অবস্থার কল্পনা একরূপ করেন নাই। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে, প্রাকৃত অবস্থায় অর্থাৎ রাষ্ট্রও সমাজ গঠনের পূর্বে মানুষ কষ্টেই ছিল; প্রত্যেককে নিজের বাহুবলের উপর নির্ভর করিতে হইত; আত্মরক্ষা ও অন্যায়ের প্রতিকার প্রত্যেককে নিজেকেই করিতে হইত; দুর্বল তাহার ধন, প্রাণ, স্ত্রী সব সময়েই বলবানের অনুগ্রহে রক্ষা করিতে পারিত; বলবান্ কেহ ঐ সব কাড়িয়া লইতে চাহিলে না দিয়া উপায় ছিল না; নিজের গায়ে শক্তি না থাকিলে, ঐ সমস্ত রক্ষা করার আর উপায় ছিল না। ক্রমশ দলগঠন বা গোষ্ঠী নির্মাণ করিয়া দুর্বলেরা এই সব অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিত। তারপর, এই আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই বৃহত্তর সমাজ ও রাষ্ট্র সংঘটিত হইতে লাগিল।

ক্রমবিকাশও কতকটা এই মতের পোষকতা করে। প্রকৃতিতে প্রাণীরা সকলেই নিজের বলের উপর নির্ভর করে। একটি সিংহীর জন্য দুই সিংহে যখন কাড়াকাড়ি করিবে, তখন পুলিশ বা ম্যাজিস্ট্রেট কেহ সাহায্য করিবে না—তৃতীয় কেহ মীমাংসা করিবে না; উভয়ের মধ্যে যুদ্ধে যে জিতিবে, সেই স্ত্রী পাইবে। আর, জীব সমূহের মধ্যে যাহারা একটু সমাজবদ্ধ হইয়াছে, তাহারা প্রত্যেকে খুব বলবান্ না হইলেও সঙ্ঘশক্তির গুণে অনেক সুবিধা করিয়া লইতে পারে; যেমন, মধুমক্ষিকা, পিপীলিকা, হাতী, বানর ইত্যাদি।

এই মত অনুসারে সঙ্ঘশক্তির সুবিধা বুঝিতে পারিয়াই মানুষ

ক্রমশ সমাজ ও রাষ্ট্রে উপনীত হইয়াছে। তাহার পূর্বের অবস্থা ভাল ছিল না—কষ্টকর, অনিশ্চিত, বিপজ্জনক ছিল।

কিন্তু একবার সম্মতি দিয়া মানুষ যে রাষ্ট্রশক্তি গড়িয়াছে, তাহা ভাঙ্গিবার অধিকার সে সেই এক মুহূর্তেই চিরতরে হারাইয়াছে। প্রথম রাজা সকলের সম্মতি লইয়া রাজা হইয়াছিলেন; কিন্তু তারপর আর রাজার আদেশের বিরুদ্ধে জনতার কিছু বলিবার রহে নাই। সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেও ঐ একই কথা।

আবার, অন্য মত এই যে, প্রকৃতির কোলে মানুষ অত্যন্ত আরামে ছিল; সকলে সমান ছিল, প্রভেদ ছিল না; সকলে সুখেও ছিল। কতকটা দুর্বুদ্ধি, কতকটা আয়েসের লোভ তাহাকে সমাজে সম্মিলিত হইতে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। ফলে, যত শ্রেণী-ভেদ, যত অত্যাচার, যত অবিচার আবির্ভূত হইয়াছে। যে সম্মতির উপর রাজশক্তির প্রথম বুনিয়াদ গড়া হইয়াছিল, জনতার সেই সম্মতি আবার তাহাকে গদিচ্যুত করিতে পারে। রাজা সব সময়ই প্রজার সদিচ্ছার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য। শুধু রাজা নয়, সম্ভ্রান্ত শ্রেণী, ধনী, অথবা সমাজের অন্যান্য সকল শ্রেণীরাও তেমনই জনসাধারণের ইচ্ছা ও সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত; এই সম্মতি লোপ পাইলে এই সকল শ্রেণীও উঠাইয়া দেওয়ার অধিকার জনসাধারণের আছে।

এই তর্কটা এখনও জীবিত। ইংলণ্ডে ১ম চার্লসের সময়, ফরাসী বিদ্রোহের সময় এবং ত্রিশ বছর আগে রুশিয়ার জার বিদায়ের সময়ও এই সকল কথা পরিস্ফুটভাবে ইউরোপের চিন্তায় দেখা দিয়াছে। কিছুকাল যাবৎ আমরা এ দেশেও এই সকল কথা ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছি।

এই আলোচনার মধ্যে কয়েকটী প্রশ্ন ও সিদ্ধান্ত মিশিয়া আছে:

( ১ ) মানুষ কি কখনও আদৌ সমাজ ছাড়া ছিল ? ( ২ ) সমাজে প্রবেশ করিবার আগে অর্থাৎ প্রকৃতির হেপাজতে সে কেমন ছিল ? ( ৩ ) সমাজ কি সম্মিলিত জনমণ্ডলীর সম্মতি দ্বারা গঠিত হইয়া ছিল ? ( ৪ ) রাজাকে কি প্রজারা সৃষ্টি করিয়াছে ? ( ৫ ) রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার অধিকার কি প্রজাদের আছে ? ( ৬ ) সমাজ ভাঙ্গিয়া দিয়া আবার ব্যক্তির পৃথক্ জীবন কি সম্ভব ?

সব সময় এই প্রশ্নগুলিকে পৃথক্ করিয়া রাখা হয় নাই বলিয়া এই আলোচনা অনেক সময় অনাবশ্যকরূপে ঘোরালো হইয়া গিয়াছে। ১৭শ-১৮শ শতাব্দীতে যে ভাবে সমাজের উৎপত্তির কথা ভাবা হইয়াছে, তাহাতে সিদ্ধান্ত এই ছিল যে মানুষ চিরকালই সমাজস্থ জীব নয়; সমাজটা কোন এক সময়ে সে নিজেই গড়িয়াছে। বর্তমানে এই সিদ্ধান্ত রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। বড় সমাজ অবশ্যই পরে হইয়াছে; ক্রমশ বৃহত্তম সমাজের—সমগ্র মানবজাতির এক সমাজের কথাও আমরা শুনিতেছি। কিন্তু একেবারে সমাজ ছাড়া—একেবারে একলা মানুষ কখনও ছিল, ইহার প্রমাণ ত নাই-ই, কল্পনা করাও কঠিন। মানবশিশু এত অসহায় যে, মার সাহায্য তাহার জন্মাবধি অনেককাল প্রয়োজন হয়। প্রাণীজগতেও মা না হইলে শিশুরা বাঁচে না; সিংহশাবকও না। সুতরাং মাতা ও সন্তানের একটা ছোট সমাজ আমরা অতি আদিতেই দেখিতে পাই। পাখীদের মধ্যে পর্যন্ত ইহা আছে। মানুষ যদি কোন কোন মাছের ডিমের মত জলে ভাসিয়া বেড়াইত, আর কখনও বড় হইত, কখনও অকালে মরিত, তাহা হইলে না হয় সমাজের বাহিরে মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যাইত। কিন্তু এমন অস্তিত্বের কোন প্রমাণই পাই না। সুতরাং মানুষ জন্মাবধিই সমাজের অন্তর্গত।

তথাপি যদিই বা ধরিয়া লই যে, আধুনিক সমাজে যে সব কৃত্রিমতা ঢুকিয়াছে সে সবের আগে মানুষ প্রকৃতির খুব কাছে ছিল—একেবারে যেন তার কোলে, তাহা হইলেই কি ভাবিতে পারি যে, সে অবস্থা খুব সুখের ছিল? ১৮-১৯শ শতাব্দীর সাহিত্যে প্রকৃতিতে ফিরিয়া যাওয়ার কথাটা অত্যন্ত প্রবলভাবে বলা হইয়াছে। পাহাড়ে, জঙ্গলে, নির্জন স্থানে শান্তি আছে, কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু কাব্যে ইহার মূল্য যাহাই হউক না কেন, দর্শনে উহাকে বাস্তব সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। মানুষের আদিম সমাজ বাস্তবিকই খুব সুখের ছিল কিনা, ভাবিবার কথা। পশুপক্ষীর সমাজের অবস্থা দেখিয়া ত মনে হয় না সেই অবস্থায় ফিরিয়া গেলে আমরা বর্তমানের চেয়ে বেশী আনন্দ পাইব। সুতরাং সমাজে প্রবেশ করিবার পূর্বে মানুষ একটা অনাবিল আনন্দে বাস করিত, ইহা নিছক কবি-কল্পনা, দার্শনিক সত্য নয়। দর্শনে কথাটা ঢুকিয়াছে, প্রমাণিত সিদ্ধান্ত হিসাবে নয়, মনোরম কল্পনা রূপে।

তারপর চুক্তি দ্বারা সমাজ গঠনের যে একটা কথা অনেকদিন চলিয়াছে, ইহাও সত্য বলিয়া মনে হয় না। কবে, কোথায়, কি ভাবে এই চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল, কেহ বলিতে পারে না। মানবমণ্ডলী কোন সময়ই কেবল পূর্ণবয়স্কের সমষ্টি নয়; শিশু, বৃদ্ধ, নারী সব সময়ই থাকে। শিশুদের সম্মতি ত লওয়া হইতেই পারে না। আর, পূর্ণবয়স্কদের ভোট লওয়াই কি সম্ভব ছিল? সুতরাং এই চুক্তির কথাটাও একটা কল্পনা।

রাজা কখনই মনোনীত হন নাই, এ কথা বলিব না। শুনিতেছি শীঘ্র নাকি স্পেনে আবার রাজা আসিবেন। যদি আসেন, নিশ্চয়ই প্রজাদের একটা সম্মিলিত সমর্থন লাভ করিয়াই আসিবেন।

এমনটী পৃথিবীর ইতিহাসে আরও ঘটিয়াছে। তবে, শক্তিহীন কখনও রাজা হয় না; আর শক্তি বেশী থাকিলে অনেকের সমর্থন ছাড়াও রাজ্য পাওয়া যায়; ইহারও দৃষ্টান্ত আছে। জয় করিয়া যাহারা রাজা হয়, তাহারা কি সেই দেশের প্রজাদের সমর্থনের প্রতীক্ষা করে?

রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করার অধিকার প্রজার আছে কিনা, এটা নিতান্তই বিতর্ক-সভার আলোচনা। শক্তি থাকিলে নিশ্চয়ই আছে; শক্তি না থাকিলে, অধিকার স্বীকার করিলেই বা কি লাভ? অবশ্যই প্রশ্নটার পিছনে একটা ইঙ্গিত এই আছে যে, রাজার বিরুদ্ধ আচরণ করা—সিংহাসনচ্যুত করা ত বটেই—শুধু যে আইনবিরুদ্ধ, তাহা নয়; ধর্মবিরুদ্ধও বটে; ইহা পাপ। রাজা-প্রজার সম্বন্ধের ধারণা এখন এত পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে যে, পাপের কথাটা এখানে না তোলাই ভাল।

সমাজ ও রাষ্ট্র পরিত্যাগ করিয়া ব্যক্তির একক জীবন যাপন করিবার অধিকার এবং সম্ভাবনা অবশ্যই আছে; বনে গেলে সহজেই তাহা হয়। আর যদি পুরাতন সমাজ ভাঙ্গিয়া নূতন সমাজ গঠনের কথা হয়, তবে সে অধিকারও মানুষের নাই বলিবে কে? তবে, সমাজ ছাড়া ব্যক্তির নিরবচ্ছিন্ন একক জীবন অতীতেও কখনও সম্ভব হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবে বলিয়া ত মনে হয় না।

## ২০। নূতন সমাজ

এইখানে আমরা কার্ল মার্কসের চিন্তা ও লেনিনের কর্মশক্তির ফলে রুশিয়াতে যে নূতন সমাজ গঠনের চেষ্টা হইতেছে তাহার প্রতি ইঙ্গিত না করিয়া পারিতেছি না। তাহা করিবার আগে আমাদের

মনে করিয়া লওয়া দরকার, সমাজের ভিত্তি কোথায়। সাধারণত বংশ ও ধর্ম এবং ভাষা ও ভূমি আশ্রয় করিয়াই পৃথক্ পৃথক্ সমাজ গঠিত হয়। ইহাদের সব কয়টী অথবা কোন একটী বা দুইটীকে আশ্রয় করিয়াও একটা সমাজ হয়। যেখানে সব লোক এক বংশের বা এক জাতির এবং এক দেশে বাস করে, এক ধর্ম এবং এক ভাষা অনুসরণ করে, সেখানে একটা আদর্শ সমাজ গঠিত হইতে পারে। কিন্তু এমনটী কদাচিৎ মিলে। ইহুদীরা জাতিতে সব এক এবং ধর্মেও এক; ইহাই তাহাদের সমাজের একত্বের ভিত্তি। নিজস্ব ভূমি তাহাদের এখনও নাই; আর ভাষাও যখন যে দেশে থাকে, সেই দেশেরই ব্যবহার করে। তথাপি পৃথিবীর সব ইহুদী কার্য্যত একই সমাজের লোক। জর্মেণীতে কিছুদিন আগে হিটলার ইহুদী উচ্ছেদ করিয়া এক জাতি, এক ভাষা এবং এক দেশের ভিত্তিতে নূতন সমাজ গড়িতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ভারতে ভূমির একত্ব রহিয়াছে, কিন্তু ভাষা, ধর্ম ও জাতির বৈচিত্র্য রহিয়াছে। এখানে এক সমাজ হইয়াছে, অনেকে স্বীকার করেন না; হইবে বলিয়াও অনেকে আশা করেন না। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এইরূপ বৈচিত্র্য কম-বেশী রহিয়াছে। সুতরাং কোন্‌টীকে প্রাধান্য দিয়া কোন্ ভিত্তিতে—সমাজ গঠিত হওয়া উচিত, তাহা একটা বড় প্রশ্ন। এসব প্রশ্ন সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রতত্ত্বের নিজস্ব জিজ্ঞাসা। কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজ দর্শনে চিন্তিত হয় বলিয়া বিস্তৃতভাবে না হইলেও সাধারণভাবে এ সকল কথা আমাদিগকেও তুলিতে হইতেছে। রুশিয়াতে আসলে সমাজ কি হইয়াছে ,তাহা এখনও অর্ধেক যবনিকার অন্তরালে; কেহ খুবই সুখ্যাতি করেন, আবার কেহ খুবই নিন্দা করেন; এবং এই উভয়ই দেখিয়াও করা হয়,

না দেখিয়াও করা হয়। সুতরাং বাস্তবের কথা বিচার না করিয়া যে আদর্শের চিত্র উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, তাহাই বিবেচনা করিব।

এই চিন্তার প্রধান কথা এই যে, সমাজের প্রতিষ্ঠা অর্থ ও উদরের উপর। কথাটা শুনিতে খুব ভাল শুনায় না; কিন্তু ভদ্রতা অনেক সময় মিথ্যায় পর্য্যবসিত হয় এবং সাজাইয়া সুন্দর করিলে বস্তুর নিজের রূপ ঢাকা পড়িয়া যায়। একটা কথা এই যুদ্ধের বাজারে আমরা প্রায়ই শুনিয়াছি যে, যুদ্ধে সেনারা সব পেটে হাঁটে। ইহার অর্থ এই যে, ভাল খাইতে পাইলে তাহারা ভাল যুদ্ধ করে। অর্থনীতিতে অনুরূপ কথাটার অর্থও এই যে, সমাজে মানুষ বাস করে, পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার করে, সবই পেটের জন্য। কারখানায় মজদুরেরা কেন খাটে? পেটের জন্য! সৈনিক যুদ্ধে প্রাণ দিতে চায় কেন? নিজের ও পরিবারের পেটের জন্য। চাষী কেন চাষ করে? পেটের জন্য। বেশী দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই। চল্‌তি সমাজে সবই চলিতেছে মানুষ উদরান্নের সংস্থান করিতে চায় বলিয়া। আবার, সমাজ যখন বিপর্যস্ত হয়, যখন ধনিকে শ্রমিকে কলহ হয়, চাষীরা খাজানা দিতে চায় না, রেলের চাকরেরা ধর্মঘট করে, তখন এ সমস্ত ক্ষেত্রেও মানুষ যাহা করে তাহা উদর পূর্তির চিন্তায়ই করে। আরও একটু বৃহত্তর দৃষ্টান্ত লওয়া যায়। রাজায় রাজায় কলহ, সেকেন্দর, সীজর বা নেপোলিয়নের দেশ জয়, হিটলারের পোল্যাণ্ড আক্রমণ—এ সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনার মূলেও ঐ একই প্রবৃত্তি—লাভের লোভ—প্রাকৃতিক সম্পদ লাভের আকাঙ্ক্ষা, আর্থিক উন্নতি অর্থাৎ নিজের এবং দেশের লোকের উদরের পূর্তি! আমেরিকায়, দক্ষিণ আফ্রিকায়, অস্ট্রেলিয়ায়---ইউরোপীয় জাতিদের উপনিবেশ স্থাপন, আদিম অধিবাসীদের উচ্ছেদ ও বিনাশ

আফ্রিকার নিগ্রোদিগকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয়—এই সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনাও ঘটিত না যদি না মানুষের উদরের চিন্তা থাকিত। সুতরাং উদর এবং উদর-পূর্তির উপায় অর্থ—ইহাই মানুষের সামাজিক পরিস্থিতি ও ইতিহাস বুঝিবার একমাত্র উপায়।

তাই যদি হয়, তবে মানুষের সমাজ হইতে যুদ্ধ, কলহ ইত্যাদি দূর করার এবং অবিমিশ্র শান্তি প্রতিষ্ঠার কি উপায়? উদরপূর্তির উপায় অর্থাৎ অর্থের সমান বণ্টন। ইহারই নামান্তর সাম্যবাদ। ইহা করিতে গেলেই সমাজকে নূতন করিয়া গড়িতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী এবং পৃথক্ অধিকার এবং অর্থের সংস্থানে বিভিন্নতা—এই সব সমাজ হইতে দূর করিতে হয়। প্রয়োজন মত ধর্মের উচ্ছেদও অভীপ্সিত নয়। অনেকের মতে ধর্ম আফিমেরই মত একটা নেশা; লোকের না থাকিলেই ভাল হয়। মিথ্যা ভয় ও লোভ দেখাইয়া উহা লোককে প্রবঞ্চিত করে। সুতরাং একটা শ্রেণীহীন এবং ধর্মহীন সমাজ গড়িতে হইবে। এই সমাজে 'অলস ধনী' শ্রেণী বিলুপ্ত হইবে। কাজ সকলকেই করিতে হইবে এবং কাজ সকলেই পাইবেও। এখন যেমন অনেক সময় এবং অনেক দেশে লোকে ইচ্ছা করিলেও কাজ পায় না এবং কাজ পায় না বলিয়া খাইতে পায় না,—একটা বেকার-সমস্যা সমাধান করিতে হয়,—তাহা থাকিবে না। আবার, কিছু না করিয়া একেবারে অলসভাবে বসিয়া বসিয়া বাবার টাকায় আরাম করিবে, এমনও কেহ থাকিবে না। কাজ? যে যাহা পারে এবং যে যে কাজের উপযুক্ত সে যথাশক্তি তাহাই করিবে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার প্রয়োজন মিটিবে না, এমন নয়। যাহার দশটী ছেলেপিলের সংসার সে দশটীর মতই খাদ্য ও বস্ত্র পাইবে;—রাষ্ট্র দেখিবে, যাহাতে সে উহা পায়। যাহার কম খরচ, তাহার

অতিরিক্ত আয় থাকিলে তাহা রাষ্ট্রের ভাণ্ডারে যাইবে। প্রত্যেকে প্রয়োজন মত দ্রব্য পাইবে এবং প্রত্যেকেই সাধ্যমত খাটিবে। ইহাই আদর্শ।

শুনিতে মন্দ নয়। বাস্তবে ইহাকে রূপ দিতে হইলে কি উপায় অবলম্বনীয়, তাহা জটিল প্রশ্ন; আদৌ ইহা বাস্তবে পরিণত করা সম্ভব কিনা, তাহাও জিজ্ঞাসার বাহিরে নয়। এই সমস্ত লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে এবং হইতেছে; দর্শনেও হয় এবং অ-দার্শনিকেরাও করেন। বর্তমান জগতের চিন্তায়—বিশেষত ইউরো-আমেরিকার চিন্তায় ইহা একটী প্রবীণ সমস্যা। ধর্মের উচ্ছেদ কি বাস্তবিকই বাঞ্ছনীয়? ধর্মে ধর্মে অতীতের কলহ ও বর্তমান বিবাদ দেখিয়া অনেকে ভাবেন, উহা না থাকিলে কি হইত? দর্শন কিন্তু বিবদমান স্থূল ধর্ম ও সার্বজনীন সূক্ষ্ম ধর্মের মধ্যে প্রভেদ দেখে; এবং এই শেষোক্তটীর রক্ষা সে চায়। তাহা ছাড়া দর্শনের পক্ষে আর একটী প্রধান সমস্যা এই যে, বাস্তবিকই কি সব মানুষ সমান, কিংবা কখনও সমান হইতে পারিবে? সাম্যবাদে অনেক জিনিসই ধরিয়া লওয়া হয়, সত্যে সে সবের প্রতিষ্ঠা আছে কি? সব মানুষ কি সত্যই সমান? গায়ের বর্ণে, উচ্চতায়, খোরাকে, কার্যক্ষমতায়, কোথায় মানুষের সাম্য সত্যই আছে? শুধু ভোগের ইচ্ছা কিংবা ভোগের সামগ্রী সকলের সমান করিতে চেষ্টা করিলেই কি প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে? প্রকৃতির বৈচিত্র্য দেখিয়া—একই পিতামাতার তিন ছেলে এক রকম হয় না, ইত্যাদি দেখিয়া—সন্দেহ কি করা যায় না যে, প্রকৃতি সম্যবাদী নয়? * তারপর আর একটা কথা। ক্ষুধা অতি সত্য জিনিস। 'যা দেবী সর্বভূতেষু

* দ্রষ্টব্য—"সংযম ও সাম্যবাদ"—প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৪৮.।

ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা' * বলিয়া ক্ষুধাকে আমরা সকলেই মানিয়া লইতে প্রস্তুত। কিন্তু সমাজ কি শুধু উহারই উপর প্রতিষ্ঠিত? স্নেহ, ভালবাসা, ভক্তি, প্রীতি এ সব কি স্বাভাবিক নয়? টাকার জন্য মানুষ সবই কি করিতে পারে? সমাজ হইতে দুঃখ কষ্ট সব দূর হইয়া যাউক, ইহা কে না চায়? রোগ, শোক, অভাব, অত্যাচার নাই এমন একটা সমাজের কথা ভাবিতে কার না আনন্দ হয়? দার্শনিকেরা এবং কবিরা চিরকালই ত উহা ভাবিয়াছেন। কিন্তু রাস্তা চাই বলিয়া পাহাড়ের গায়ে মাথা ঠুকিলেই পাহাড় সরিয়া যাইবে না ত? মানুষের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির এবং সমাজের ভিত্তির পূর্ণ সত্য আলোচনা না করিয়া একটা সুন্দরতম সমাজের কল্পনা করিলে কাব্য হইতে পারে, কিন্তু দর্শন হয় না। † যুগে যুগে দার্শনিকেরাও কবিদের সঙ্গে মর্ত্যে স্বর্গরাজ্যের কল্পনা করিয়াছেন; কিন্তু ইহাকে বাস্তবে রূপ দিতে কবিও পারেন নাই, দার্শনিকও নয়। সুন্দরতর জগতের আকাঙ্ক্ষা আমরা করি—আশাও পোষণ করি; কিন্তু সাম্যবাদই কি তাহার একমাত্র পন্থা? আমাদের সিদ্ধান্ত কাজেই এই হইবে যে, নূতন সমাজের পরিকল্পনায় চিন্তা হইতেছে প্রচুর, কিন্তু সহজেই এবং সকলের গ্রহণযোগ্য মীমাংসা এখনও কিছু হয় নাই। প্রশ্ন প্রশ্নই রহিয়া গিয়াছে।

সমাজে রাষ্ট্র অপেক্ষা মূল্যবান্ গৃহ। এখানে পতি, পত্নী ও সন্তান স্নেহের ডোরে বাঁধা থাকে; সুতরাং মানুষের সহজাত প্রকৃতিই

* চণ্ডী—৫।২৮

† দ্রষ্টব্য—(১) 'Mansions of Philosophy'—W. Durant (Ch. on 'How we made Utopia'); (২) Brave New World—Aldous Huxley; ইত্যাদি।

ইহার ভিত্তি। কিন্তু গৃহেরও অনেক বিপর্যয় ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। পাশ্চাত্ত্যে বিশেষত রাষ্ট্রের শক্তি অনেক বাড়িয়া চলিয়াছে। রাষ্ট্র প্রত্যেক ব্যক্তিকে ব্যক্তিহিসাবেই দেখে, এবং তাহাকে মজুর বা কেরাণী বা সৈনিক রূপে ব্যবহার করে; স্ত্রী-পুরুষের ভেদও কদাচিৎ মানে। ইহার ফল ভাল কি মন্দ, ভাবিবার মত প্রশ্ন। পশ্চিমে ইতিমধ্যেই অনেকে আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। একজন বলেন "আজ রাষ্ট্র ক্রমশ বলবত্তর হইয়া উঠিতেছে, এবং গৃহ এবং পরিবার একটা অনিশ্চিত পরিবর্তনের ভিতর দিয়া চলিয়াছে; গৃহের বদলে বাড়ী, সন্তানের বদলে কুকুর আসিতেছে; স্ত্রী-পুরুষের মিলন এখনও হয় এবং কখন কখন সন্তানও হয়; কিন্তু এই মিলন সব সময় বিবাহ নয়; আর, বিবাহও সব সময় মাতৃত্ব পিতৃত্বের জন্য নয়; আর সন্তানেরা জনক-জননীর কাছে শিক্ষা পায় কদাচিৎ"।* ব্যাপারটা এদেশেও যে আস্তে আস্তে না ঘটিতেছে, এমন নয়। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকেরা যেমন এদিকে দৃষ্টি না দিয়া পারিতেছেন না, আমাদের ভাবুকদেরও তেমনই একটু সজাগ থাকা উচিত। গৃহ-হীন সমাজ ও রাষ্ট্রের চিত্র আমাদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করিবে, না, আশার সঞ্চার করিবে?

* "But to-day the State grows stronger and stronger, while the family undergoes a precarious transformation from homes to houses and from children to dogs. Men and women still mate and occasionally have offspring. But the mating is not always marriage, the marriage is not always parentage and parentage is not often education".—W. Durant, "Mansions of Philosophy"; p. 396.

## ২১। ইতিহাস, সভ্যতা ও ক্রমোন্নতি

ইতিহাস ঠিক দর্শনের অঙ্গ নয়; কখনও ছিলও না এবং হইবেও না। সাধারণত ইতিহাস অর্থে আমরা রাজপরিবর্তন, যুদ্ধ, বিপ্লব, ইত্যাদি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ঘটনার ক্রমিক বিবৃতি বুঝি। সেগুলি ঠিক দর্শনের আলোচ্য নয়; রেলের টাইম্-টেবল্ বা দিন-পঞ্জিকা যেমন নয়, ঠিক তেমনই। কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজ সম্বন্ধেও দর্শন উদাসীন নয়; ইতিহাসের অর্থও সে বুঝিতে চায়। রাষ্ট্রের আইন কানুন, সমাজের আচার নিয়ম যেমন দর্শন আলোচনা করে না, জগতের বিভিন্ন দেশের কতকগুলি ঘটনার ক্রমিক বিবরণ ও দর্শনের কাছে খুব মূল্যবান নয়। কিন্তু রাষ্ট্রের ও সমাজের স্বরূপ ও আদর্শ যেমন দর্শন ভাবে, তেমনই ইতিহাসের ঘটনাবহুল বিবরণের প্রকৃত অর্থ কি, তাহাও দর্শন বুঝিতে চায়। আকাশে বিস্তৃত জগৎ যেমন একটা আলোচনার বিষয় তেমনই কালে বিস্তৃত ঘটনার রাশির কি অর্থ, তাহাও দর্শনের উপেক্ষার বস্তু নয়। সেইজন্য রাষ্ট্রের দর্শন বলিয়া যেমন দর্শনের একটা শাখা স্বীকৃত, ইতিহাসের দর্শনও তেমনই একটা স্বীকৃত শাখা। দর্শনের চুম্বক মাত্র যে জানিতে চায়, তাহারও একবার এদিকে চোখ বুলাইয়া লওয়া উচিত।

সেকেন্দর শাহ কোন্ সনে কিংবা কোন্ মাসে সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন কিংবা বিক্রমাদিত্যের কয়টা হাতী ছিল অথবা তানসেন বাদশাহকে রোজ কয়টা গান শুনাইতেন, এই ধরণের সব ঘটনা দর্শনের কাছে ইতিহাসের বড় ঘটনা নয়। দর্শনের নিকট মূল্যবান ঘটনা জাতির ও সাম্রাজ্যের উত্থান পতন, ধর্মের, শিল্পের, ভাষার ও সাহিত্যের এবং আইনকানুন ও আচারের, এককথায় সভ্যতার আবির্ভাব ও তিরোভাব, ইত্যাদি। আর, দর্শন ইতিহাসকে কোন

দেশবিদেশের সম্পত্তি না ধরিয়া জগতের সম্পত্তি ধরিয়া লয়। দুই একটা বড় ঘটনার নাম করিলেই দৃষ্টান্তের কাজ হইবে। ইহুদী জাতির কোথায় আবির্ভাব হইয়াছিল, মিশরে ফেরাউনের অধীন হইল কেন, এবং আবার কিভাবে মুক্ত হইল? ফেরাউনদেরই সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া গেল কেন? ভাষায়, চিন্তায় ও শিল্পে রোম গ্রীস হইতে ভিন্ন হইল কেন? রোম গেল কেন? ইত্যাদি। সকলের উপরে দর্শনের বড় প্রশ্ন, এই সব ঘটনার—এই আবির্ভাব-তিরোভাব ও উত্থান-পতনের অন্তরালে কি কোন গূঢ় অর্থ প্রচ্ছন্ন আছে? ইতিহাসকে আমরা কি ভাবে বুঝিব? শুধু প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়া? না, কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত কোন বুদ্ধিমানের লীলা? ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে হেগেল এই প্রশ্নটাকে গণনার যোগ্য করিয়া দার্শনিকের আসরে উপস্থিত করেন এবং তিনি ইহার একটা উত্তরও দেন। ইতিহাসের প্রকৃতি সম্বন্ধে যে সমস্ত মত ব্যক্ত হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে এই:—
(১) জগতে অন্যত্র যেমন ইতিহাসেও তেমনই যাহা আমরা দেখি, তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছার অভিব্যক্তি মাত্র, ইহা কাহারও কাহারও মত। ঈশ্বর প্রমাণিত ও স্বীকৃত হইয়া গেলে এবং জগতের সর্বত্র ও মানুষের জীবনেও তিনি সক্রিয়, ইহা মানিলে ইতিহাসের এই অর্থ মানা সহজ হয়। কিন্তু ইহার প্রত্যেকটী লইয়াই তুমুল বিতণ্ডা সম্ভব এবং হইয়াছে। পক্ষের ও বিপক্ষের কোনও যুক্তি এখানে উদ্ধৃত না হইলেও চিন্তাশীলেরা তাহার কিছু কিছু অনুমান করিতে পারিবেন।

(২) বিদ্যুতের ক্রিয়া বুঝিবার জন্য যখন আমরা ঈশ্বরের কথা মনে করি না, তখন ইতিহাস বুঝিবার জন্য তাঁহাকে স্মরণ করিব কেন? জগতের অন্যান্য ঘটনার ন্যায় ঐতিহাসিক ঘটনাও নৈসর্গিক

কারণে ব্যাখ্যা করা যায়। এই সব নৈসর্গিক কারণের মধ্যে ভৌগোলিক অবস্থান, জাতিগত বৈশিষ্ট্য, আর্থিক প্রয়োজন গণ্য করা হইয়াছে। সব দেশের যে ইতিহাস নাই, সব দেশ যে সভ্য হয় না, ভৌগোলিক অবস্থান তাহার একটা কারণ। মধ্য আফ্রিকার নিগ্রোরা এখনও অসভ্য, সে দিনও জন্তুর মত বিক্রীত হইয়াছে, মধ্য আফ্রিকার ভৌগোলিক অবস্থান তাহার একটা কারণ। আবহাওয়া, সমুদ্র হইতে দূরত্ব, নদী, বন ও আকাশের বর্বর ও অনুদার আচরণ—এই সব নানা কারণে ওখানকার লোকেরা বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই এবং তাহাদের ইতিহাস নাই; আবার নীলনদীর উপত্যকার লোকেরা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, পিরামিড্ গড়িয়াছিল, এই সব বাধা তাহাদের ছিল না বলিয়া। জাতিগত বৈশিষ্ট্যও ইতিহাসের ঘটনাসমূহের একটা কারণ। মানুষের মধ্যে সকল জাতির শক্তি সমান থাকে না; সৃষ্টির বৈষম্য আছে; গ্রীকরা বা রোমানরা যে সব গুণ লইয়া আসিয়াছিল, আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের তাহা ছিল না। সুতরাং এক জায়গায় ইতিহাস হইয়াছে; অন্য জায়গায় কিছু বলিবার নাই।

আর্থিক সম্পদ—প্রকৃতির অনুগ্রহও সকল দেশ সমান পায় না। আগুন ছাড়া সভ্যতা হয় না; আগুনের বড় ইন্ধন কয়লা; এখন হইয়াছে তেল (পেট্রল)। এ সব সম্পদ যে দেশে আছে বা যে দেশ আগে পাইয়াছে, সে দেশ সভ্যতাও সৃষ্টি করিয়াছে এবং তাহার ইতিহাসও আছে।

(৩) মহাপুরুষের—বীর ও অতিমানবের—আবির্ভাবও ইতিহাস ও সভ্যতার আবির্ভাবের একটা কারণ বিবেচিত হইয়াছে। অনেকে মনে করিয়াছেন যে ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে কোন জাতির সম্পত্তি নয়;

ইহা জগতের বীরপুরুষদের জীবনী মাত্র। ইতিহাস বলিতে এখনও অনেকে রাজাদের জীবনী ও রাজত্বের প্রণালী যে না বুঝেন এমন নয়। ১৮শ শতাব্দীর ফরাসীদেশের ইতিহাস কি? বুরবোঁ রাজাদের রাজত্ব ও শোষণ, আর নেপোলিয়নের কীর্তি,—এইত! আর কিছু নয়। তেমনই অন্য সব দেশেও যাহা ঘটে তাহা তখনকার সে দেশের কুরু-পাণ্ডবদিগকে কেন্দ্র করিয়াই ঘটে। বাকী যে অসংখ্য জনতা, তাহা পাদমূলে পড়িয়া থাকে এবং মরিয়া যায়, এই মাত্র।

কিন্তু এই মত অনেকে অগ্রাহ্য মনে করিয়াছেন। তাঁহাদের মত এই যে, বীর-মানবের আবির্ভাবেরও ত একটা হেতু থাকা দরকার? নেপোলিয়ন কিংবা হিট্‌লার ত সব দেশেই বছরে একটী করিয়া দেখা দেয় না। শতাব্দীতে একটী কদাচিৎ আসে। কেন, ঐ সময়ে ঐ দেশেই উহাদের আবির্ভাব হয়, অন্যত্র কিংবা অন্য সময়ে হয় না কেন? ইহার উত্তর, মানুষের সমাজে সকলের ভিতরই একটা শক্তি ক্রিয়া করিতেছে; তাহারই একটা বিকাশ অতিমানবের আবির্ভাব। জল আন্দোলিত হইয়া যেমন কোন এক জায়গায় একটা ঢেউ সৃষ্টি করে, ঢেউ আন্দোলনটা সৃষ্টি করে না, তেমনই সমাজে একটা সক্রিয় শক্তির প্রকাশ মহাপুরুষদের ভিতর, কিন্তু তাহারা ঢেউয়ের মত—ঐ আন্দোলনের ফল, ঐ শক্তির স্রষ্টা নহেন। সমাজ রক্ষা করে অতি শ্রেষ্ঠ লোকেরা নয়, মধ্যম শ্রেণীর লোকেরা; তাহাদেরই বংশ বাড়ে, এবং তাহাদের ভিতরই সমাজের শক্তি আস্তে আস্তে কাজ করে; জলে ঢেউয়ের মত কখনও সেই শক্তি উপর দিকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া একটা মহাপুরুষ আনয়ন করে; তাঁহার উদ্দিষ্ট ক্রিয়া সমাপ্ত হইলেই সেই মহাপুরুষ নিরুদ্দিষ্ট হন। মহাপুরুষের বংশে অনবরত মহাপুরুষই হইতে থাকে না; ঢেউ ভাঙ্গিয়া

গিয়া যেমন আবার সমতল জল হয়, ঠিক তেমনই, হয় মহাপুরুষদের কোন বংশ থাকে না, যেমন যীশুর নাই; অথবা যাহারা তাঁহাদের বংশে জন্মে তাহারা আবার সাধারণ মধ্যম শ্রেণীর লোক হইয়া যায়, যেমন বুদ্ধের ছেলে অথবা অশোকের ছেলে!

ইতিহাস সম্বন্ধে এত সব বিবিধ মতের মধ্যে ঐক্য সম্পাদন করিয়া কোন শেষ সিদ্ধান্ত কি আমরা করিতে পারি? একটা কথা আমাদের মনে রাখা উচিত যে, মানুষের ইতিহাস সমগ্র জগতের মধ্যে একটা অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। একটা ঢিল ছুড়িলাম, জানালার কাচটা ভাঙ্গিয়া গেল, এই ধরণের সোজা ব্যাপার ইতিহাস নয়। ইতিহাস যাহা তাহা হয়, একাধিক কারণের সমবায়ে। সুতরাং যত সব ব্যাখ্যা ইতিহাসের দেওয়া হইয়াছে, তাহার কোনটাই একমাত্র সত্য নয়, অথচ কোনটাই অসত্যও হয়ত নয়। মনে হয়, সবটীর মধ্যেই একটু একটু সত্য রহিয়াছে। তবে, ঈশ্বর মানিলে জগৎ বুঝিতে সুবিধা হয়, ইতিহাস বুঝিতেও তেমনই। ঈশ্বর নানাভাবে নিজেকে দেশে ও কালে ব্যক্ত করিতেছেন, বলিতে দোষ কি? *

ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার কথাও উঠিবে। একটা সভ্যতা মানুষ সৃষ্টি করিয়াছে; মানবের দীর্ঘ ইতিহাসের পরিণতি, আজ পর্যন্ত একটা সভ্যতা। এই সভ্যতার অর্থ বুঝান নিষ্প্রয়োজন; প্রত্যেকে প্রত্যেককে বুঝাইতে না পারিলেও মোটামুটি ইহার অর্থ আমরা বুঝি। এই সভ্যতার মধ্যে প্রভেদ আছে, স্তর ভেদ আছে তাহাও আমরা জানি। পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য সভ্যতার প্রভেদের কথা অনেক সময়ই ভাবি; এবং এই উভয়েরই প্রত্যেকেই নিজেকে অপরের চেয়ে উৎকৃষ্টও মনে করিয়া থাকে। তাহা হইলেও সভ্য

* তুং "God fulfills Himself in many ways".

অবস্থা অসভ্য অবস্থা হইতে যে পৃথক্, সাধারণভাবে ইহা বুঝিতে আমাদের কষ্ট হয় না। সুতরাং সভ্যতা আমাদের অজানা জিনিস নয়, ইহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি। এখন প্রশ্ন এই, মানবের এই সভ্যতার ভবিষ্যৎ কি? ইহা কি টিকিবে? না, জলের বুদ্বুদের মত একদিন কালের গর্ভে বিলীন হইয়া যাইবে? আর তাই যদি যায়, তবে সে দিন কি দূরে, না ঘনাইয়া আসিয়াছে?

এ সব কথা কেন উঠে? ব্যক্তির জীবনে এমন একটা সময় কি আসে না, যখন তাহাকে শেষের প্রশ্ন ভাবিতে হয়? বার্দ্ধক্য যখন ঘনাইয়া আসে, তখনও মৃত্যু কি অনেক দূরে? তখন ভয়ে হউক, আনন্দ হউক অথবা উদাসীনতার সহিত হউক, মৃত্যুর কথা মানুষের মনে উঁকি দেয় না? তেমনই জাতিরও ত একটা বার্দ্ধক্য আছে; ভোগেও ত একটা ক্লান্তি আসে। দিগ্বিজয় করিয়া করিয়া সেকেন্দর যেমন ক্লান্ত ও শূন্য বোধ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, 'আর ত পৃথিবী নাই যে জয় করিব', তেমনই জগতের জাতিরা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, উপনিবেশ স্থাপন, পরস্ব অপহরণ, ভিন্ন দেশ ও জাতির শোষণ ও তাহার উপর অত্যাচার করিয়া করিয়া হয়রাণ হইয়া এক সময় কি মনে করিবে না, 'এর পর কি?' পাশ্চাত্ত্যে এই ভাবেই প্রশ্নটা উঠিয়াছে *। কিছুকাল যাবৎ অনেকে মনে করিতেছেন যে, ইউরোপীয় সভ্যতার অবনতি আরম্ভ হইয়াছে, অবলোপ বেশী দূরে নয়।

এই বিংশ শতাব্দীর গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে দুইটী জগৎব্যাপী মহাসমর হইয়া গিয়াছে। তাহাতে জগতের কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে, সে বিচারের স্থান ইহা নহে; কিন্তু সভ্যতারও যে

* দ্রষ্টব্য—(১) Max Nordean—Degeneration. (২) Spengler—The Decline of the West ইত্যাদি

প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে, ইহা আমাদের ভাবা উচিত। এখানে সেখানে সৈনিকদের বর্বর ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণের বিবরণ প্রায়ই খবরের কাগজে বাহির হয়। সেগুলিকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র মনে করিলে ভুল হইবে। এ সকলের ভিতরে একটা গভীর নৈতিক অবনতি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। নীতি ও ধর্ম অমান্য করা ফ্যাশন হইয়া গিয়াছে এবং অসত্য এখন অত্যন্ত প্রবল। যুদ্ধে যে হারে তাহার ত অনেক ক্ষতিই হয়, কিন্তু যে জিতে তাহারও ক্ষতি কম হয় না। জয়ী আমেরিকার সৈনিকেরা চীনে ও জাপানে একটু বেশী আনন্দে দিন কাটাইতেছে বলিয়া মাঝে মাঝে শুনি। বর্ণ সংকরের উৎপত্তি যুদ্ধের পরে হয়, একথা দুই হাজার বছর আগে অর্জুন বলিয়াছিলেন। * বর্ণ-সংকরের উৎপত্তি সমাজের পক্ষে ভাল কি মন্দ, সে সম্বন্ধে জীববিদ্যা এখনও নিশ্চিত কোন মত প্রকাশ করে নাই। কিন্তু ইহার পিছনে যে উচ্ছৃঙ্খলতা আসে, তাহা সভ্যতার হানি করে।

তার উপর অস্ত্র ব্যবহারের বর্বরতা। আগে যুদ্ধের নিয়ম ছিল, যাহার হাতে হাতিয়ার নাই তাহাকে আঘাত করা হইবে না; আর সতর্ক না করিয়া শত্রুকেও আঘাত করা হইবে না; এখন সে সব নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে। রাজায়-রাজায় অথবা শাসক মণ্ডলীদের মধ্যে হয় কলহ; মরিবার বেলায় বৃদ্ধ, শিশু, স্ত্রী কেহই বাদ যায় না। তার উপর আণবিক বোমার ব্যবহার। ইহার ব্যবহারের নিন্দাও কেহ কেহ করিয়াছেন, বিশেষত বিলাতে কোন কোন ধর্মযাজক এবং এই বোমা আবিষ্কারের দেশ আমেরিকায়ও কেহ কেহ ইহার নিন্দা করিয়াছেন—যেমন মিসেস্ পার্ল-বাক; কিন্তু খুব বেশী লোকে নয়। আর, ইহার প্রস্তুতির রহস্য চুরি করিবার চেষ্টা অন্য দেশও করিতেছে বলিয়া শুনি। কি ফল হইবে?

* গীতা—১।৪০

১৯১৪ সালের যুদ্ধের সময় অনেক বড় বড় বুলি রাজনীতিকদের মুখে শুনিয়াছিলাম। রাজনীতিকেরা সব সময় সত্য কথা বলেন না, ইহা প্রসিদ্ধ; বেশী ভাবিতে পারেন বলিয়াও মনে হয় না। তখন শুনিয়াছিলাম, ঐ যুদ্ধ হইতেছিল, ভবিষ্যৎ যুদ্ধ শেষ করিবার জন্য; আর যুদ্ধ যাহাতে না হয়, সেইজন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হিমালয় মূষিক প্রসব করিলেন; একটী ‘জাতি সংঘ’ উৎপন্ন হইল। তারপর এ উহার পিট চুলকাইয়া কিছুদিন আনন্দ উপভোগ করিলেন; তারপর চুলকানির বদলে সুড়সুড়ি, ক্রমে কিল চড় ও ঘুষাঘুষি! হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলেন; আবার কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। আপাতত থামিয়াছে, কিন্তু অস্ত্রে শাণ দেওয়া চলিতেছে। তৃতীয় সর্ব-জাগতিক যুদ্ধের কাল মেঘ নাকি ঐখানে ইতিমধ্যেই দেখা যাইতেছে। এবার আণবিক বোমা চলিবে। নগর গ্রাম ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। ফল? সভ্যতা থাকিবে? একজন আশ্বাস দিয়াছেন, অনেক মরিবে কিন্তু কিছু থাকিবে এবং কয়েকখানা বই রক্ষা পাইবে, সুতরাং সভ্যতা আবার কায়কল্প করিয়া আত্মরক্ষা করিবে। বই যে কয়খানা বাঁচিবে তাহাদের মধ্যে আমাদের এইখানি থাকে যেন, ইহা আকাঙ্ক্ষা করি। কিন্তু খানকয়েক বই আর জন কয়েক লোক থাকিলেই কি সভ্যতা রক্ষা পাইবে? স্তূপীকৃত মানব দেহ পচিয়া বা ভস্ম হইয়া যাইবে; তাহা হইতে যে সব কৃমি-কীট উৎপন্ন হইবে, নূতন নূতন ব্যাধির বীজ আবির্ভূত হইবে, তাহারাই অবশিষ্ট মানব কয়টী ও বই কয়খানা শেষ করিয়া জগৎ হইতে মানুষের চিহ্ন মুছিয়া ফেলিবে না ত? সভ্য জগতের জ্ঞানোদয় এখনও হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না; সুতরাং কোন ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারিতেছি না।

সমগ্র মানবজাতির সমগ্র সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ছোট খাটো

স্থানীয় এবং বিশিষ্ট সভ্যতার কথাটাও তুলা যাইতে পারে। ইহুদীরা নানা দেশে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া এবং নানা ভাষা গ্রহণ করিয়াও একটা জাতিগত সাম্য ও সভ্যতা প্রায় অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। আর কতকাল তাহা পারিবে? ভারতেও প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা ও মুসলমান সভ্যতা আত্মরক্ষার জন্য—নিজেদের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য—মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে। অথচ উভয়ের উপরই নানা দিক হইতে—বিশেষত পশ্চিম হইতে—নানা রকম আঘাত পড়িতেছে। সত্যই কি ইহারা চিরকাল ইহাদের প্রাচীন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারিবে? না, একটা বৃহত্তর নূতন সভ্যতার মধ্যে লুপ্ত হইয়া যাইবে? সমুদ্রে নদীর জলের মত, বড় নদীতে ছোট নদীর জলের মত, একটা বড় সভ্যতায়—এইরূপ দেশ-বিশেষের ছোট সভ্যতার বিলোপের দৃষ্টান্ত ত ইতিহাসে বিরল নয়।

কিন্তু একটা ছোট সভ্যতার লোপ সমগ্র মানব জাতির সভ্যতার লোপের মত বড় ঘটনা নয়। ইহা ঘটিয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও ঘটিবে। কিন্তু সভ্যতার একেবারে বিলোপটা নির্ভয়ে এবং উদাসীনভাবে চিন্তা করা যায় না। সমগ্র মানব জাতির সম্পত্তি সর্ব বিশ্বের সভ্যতার ভবিষ্যৎ কি, দার্শনিকেরা তাহাই ভাবেন। ভাবিবার সময় হয়ত ইউরো-আমেরিকার সভ্যতার প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে বেশী; কিন্তু তাহা হইলেও প্রশ্নটা সাধারণ এবং আলোচনাও হয় সাধারণ ভাবে।

সভ্যতার সঙ্গে আরও একটা কথা উঠিতে হয়ত পারে, সেটা মানুষের দৈহিক ক্রমোন্নতি। ক্রমোন্নতির অভিভাবকেরা সাধারণত ধরিয়া লন যে, মানুষ দেহে ও মনে ক্রমশ ভাল হইতে অধিক ভাল, সুন্দর হইতে অধিকতর সুন্দর হইতেছে। কিন্তু কথাটা কি ঠিক? কোনও একটা জায়গায় গিয়া আবার পশ্চাৎগমন, অবনতি, আরম্ভ

হইতে পারে না? সভ্যতার উচ্চস্তর হইতে যেমন জাতির অধঃপতন সম্ভব, তেমনই মানুষের বংশে ক্রমশ কালের স্রোতে অ-মানুষের অথবা নিকৃষ্ট মানুষের আবির্ভাবও কি সম্ভব নয়? যোদ্ধা জাতিরা তাদের যুদ্ধশক্তি হারায়, সে কথা ইতিহাস জানে; বীর শিখেরা কৃপাণ সঙ্গে রাখিয়াও অবশেষে বহু ট্যাক্সিওয়ালা হইয়াছে, ইহাও আমাদের দেশে দেখিতে পাই। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বংশে পরিচারক মাত্র জন্ম নেয়, ইহাও ত অজানা নয়। ব্যাপকভাবে এইরূপ অধঃপতনের সম্ভাবনাটা যদি দেখি, তবে, ইহা কি একেবারেই কল্পনার অতীত যে মানুষের বংশধরেরা সুদূর ভবিষ্যতে শুধু বামন, বা বানর বা পোকা মাকড়ে পরিণত হইয়া যাইবে? ক্রমবিকাশ কালের স্রোতে শুধু উন্নতি বহন না করিয়া অবনতিও ত আনিতে পারে। তাহা হইলে মানুষের নিবিড় অবনতি, এমন কি, একেবারে বিলোপও আশঙ্কা করা যুক্তিহীন নয়!

মানুষ না থাকিলেই পৃথিবীও নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে, একথা কেহ বলে না। কিন্তু সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যেমন একটা অন্ধকার কেহ কেহ দেখিতেছেন, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও তেমনই একটী আশঙ্কা মানুষের মনে ঢুকিয়াছে। ইহার জন্য দায়ী বিজ্ঞান। বিজ্ঞানে তাপ বিকিরণের এই একটা নিয়ম আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, কোন উত্তপ্ত পদার্থ তাপ বিকিরণ করিয়া ক্রমে যে তাপ হারাইতে পারে, বাহির হইতে সেই তাপ আবার টানিয়া লইয়া সে উত্তপ্ত হইতে পারে না। এক টুকরা লোহাকে আগুনে দিয়া গরমে লাল করিয়া তুলিয়া ফেলিলে, তখন উহার তাপ চারি দিকের বায়ুর চেয়ে অনেক বেশী হইবে। কিন্তু ক্রমশ ঠাণ্ডা হইয়া উহা বায়ু অপেক্ষাও ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে; অথচ, বায়ুর তাপের পরিমাণে যখন পৌছিবে তখনই 'আর তাপ বিকিরণ বন্ধ করিতে পারিবে

না অথবা বায়ু হইতে তাপ টানিয়া লইয়া আবার পূর্বের মত গরম হইতে পারে না। উহাকে আবার কোনও প্রকারে গরম করা যায় সত্য; কিন্তু যে তাপ উহা হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহা ফিরাইয়া পাইবার উপায় নাই। সে তাপ চিরকালের জন্য লুপ্ত—অনন্ত আকাশে বিকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই যে তাপ-বিকিরণের নিয়ম, ইহা ত সূর্যেও খাটে। সূর্য প্রতি সেকেণ্ডে কি পরিমাণ তাপ হারাইতেছে, তাহা প্রকাশ করিতে যে কোন একটা দাহ্য বস্তুর যেমন কয়লার, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পুড়াইলে যে তাপ উৎপন্ন ও বিকীর্ণ হয়, তাহাকে একক ধরা যাইতে পারে; পরে যে কোন একটা অঙ্ক লইয়া তাহার ডানদিকে ৭।৮টা শূন্য বসাইয়া তত মণ কয়লা পুড়ানোর তাপ সেকেণ্ডে সূর্য হারায় বলিলে বিশেষ ভুল হইবে না। সূর্যের এই তাপক্ষয় অনবরত চলিতেছে। কিন্তু তাহার বাহির হইতে তাপ গ্রহণের কোন উপায় নাই। ইহার শেষ কি হইবে? হিসাব মত যাহা হওয়া উচিত তাহা এই যে, সূর্য একদিন একেবারে তাপহীন হইয়া চন্দ্রের মত মরিয়া যাইবে! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মরিবে তাহার সমগ্র পরিবার! পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি। তাহাতেই জগৎ ধ্বংস হইবে না হয়ত; কেন না, তখনও ধ্রুবতারা কিংবা লুব্ধক নক্ষত্র আলো ও তাপ বিকীরণ করিতে থাকিবে হয়ত। কিন্তু জীবের সমাপ্তি ঐ খানেই হইবে এবং আমাদের এই বইখানার এক কপিও আর থাকিবে না হয়ত। পৃথিবী তখনও থাকিতে পারে; কিন্তু দিন রাত থাকিবে না, শীত গ্রীষ্ম থাকিবে না, আর সর্বোপরি কোন জীব থাকিবে না, একটা গাছও না! ইহাকে জগতের ধ্বংস বলিতে দোষ কি? শুধু পৃথিবীই ধ্বংস পাইবে, এমনও নয়। দমদেওয়া ঘড়ির মত এই জগৎ-যন্ত্র—সমস্ত সৌর-পরিবার ও নক্ষত্রসমূহ চলিতেছে। দম ফুরাইলে ঘড়িরই মত একদিন এই

সমস্ত বিশ্বটাও অচল হইয়া যাইতে পারে; তাহার অর্থই উহার বিনাশ। সুতরাং শুধু সভ্যতার নয়, শুধু পৃথিবীর নয়, সমগ্র বিশ্বের বিলোপও একদিন ঘটিতে পারে। তাহা হইলে শুধু মানুষের নয়, তাহার সভ্যতার নয়, স্রষ্টার সমস্ত সৃষ্টির ভবিষ্যৎই অন্ধকার দেখায় না কি?

এই কি শেষ কথা? তাহা বোধ হয় নয়। একদিকে সভ্যতার ও পৃথিবীর এই অন্ধকার ভবিষ্যতের কল্পনা রহিয়াছে; অপরদিকে ইহা সত্ত্বেও জগতে একটা ক্রমোন্নতি অনেকে দেখিতে চাহেন।* সূর্যের নিবিয়া যাওয়ার আশঙ্কার বিরুদ্ধে আশাবাদীরা বলেন যে, ইহা কি সম্ভব নয় যে সূর্যের কতকগুলি পরমাণু ফাটিয়া গিয়া আবার তাহাকে কয়েক কোটি বৎসরের জন্য উত্তপ্ত ও আলোকান্বিত করিয়া দিবে? অথবা কোথাও হইতে কোনও একটা ধূমকেতু কিংবা নক্ষত্র কোন কারণে ছুটিয়া আসিয়া সূর্যে পড়িয়া আবার কয়েক কোটি বৎসরের মত আলো ও তাপ উৎপাদিত করিয়া দিবে? অনন্ত আকাশের সব কিছুই কি আমরা জানি? বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই কি আমাদের জ্ঞানে ধরা পড়িয়াছে? তাহা ছাড়া, না হয় সূর্য নিবিয়াই গেল, না হয় সে সপরিবারে যাহা আছে তাহা আর রহিল না, না হয় পৃথিবীর জীব ও উদ্ভিদ্ সব লোপই পাইল; তাহাকেই জগতের লোপ মনে করার কি যুক্তি আছে? আরও ত কত শত সূর্য ও সূর্য-পরিবার আকাশে ছড়াইয়া রহিয়াছে; এবং অন্য কোথাও ত নূতন ভাবে জীবের আবির্ভাবও হইতে পারে। আরও একটা জগতের আবির্ভাবও ত হইতে পারে। তাহা ছাড়া, জগৎটাকে একটা যন্ত্রই বা ভাবিব কেন? উহাকে কবির অনুভূতি বা দার্শনিকের চিন্তার সঙ্গে কি তুলিত করা যায় না? তাহা হইলে ত ঘড়ির মত বন্ধ হইয়া

* দ্রষ্টব্য—(১) W. R. Inge—'God and the Astronomers'; (২) Drummond—"The Ascent of Man"; ইত্যাদি।

যাওয়ার কথা এখানে উঠে না? সুতরাং জগৎ-লোপের ভীতিটা অবাস্তব।

সভ্যতা লোপের ভয়ই কি সত্য? অনেক সভ্যতা লোপ পাইয়াছে —সিরিয়ার, মিশরের, গ্রীসের, প্রাচীন সভ্যতা লোপ পাইয়াছে, ইহা ত কেহ অস্বীকার করে না। কিন্তু ব্যক্তির মরণে যেমন জাতির মরণ হয় না, তেমনই কোন একটা বিশিষ্ট সভ্যতা লোপ পাইলেই সাধারণ ভাবে সভ্যতার লোপ হয় না। প্রাচীনের স্থানে আধুনিক সভ্যতা আসিয়াছে; আবার হয়ত ইহাকে রূপান্তরিত করিয়া ভাবী সভ্যতা আসিতেছে। মৃতকে সৎকার করিয়া যেমন গৃহীরা আবার গৃহের কাজে নিমগ্ন হয়, তেমনই মৃত প্রাচীনকে ভুলিয়া গিয়া বর্তমান হইতে ভবিষ্যতের দিকে তাকাইলে হতাশ হওয়ার তেমন কি কারণ আছে? আমরা মানুষেরা কি ছিলাম, আর কি হইয়াছি? জঙ্গলে অথবা পর্বতের গহ্বরে থাকিতাম, পশুপক্ষীর সঙ্গে কাড়াকাড়ি করিয়া কাঁচা ফল বা কাঁচা মাংস খাইতাম; শীতে গায়ের লোমের আচ্ছাদনের উপর নির্ভর করিতাম আর গ্রীষ্ম বোধ হইত কি না সন্দেহ; হইলেও গাছের তল ছিল আশ্রয়! আর এখন? এখনকার অবস্থা কি বর্ণনার প্রয়োজন? এই সব ভাবিলে আশার আনন্দে রোমাঞ্চ হয় না কি? মন খারাপ করিবার মত কি হইয়াছে?

'হ্যাঁ' আর 'না', এই উভয়ের মধ্যবর্তী কিছু বলিতে হইলে বলিতে হয় 'হইতে পারে'। দুইটী পরস্পর-বিরোধী দৃষ্টি-ভঙ্গীর সমন্বয় করা কঠিন। সুতরাং 'দেখা যাক্ কি হয়' বলিয়া সিদ্ধান্ত অনিশ্চিত রাখাই শ্রেয়। যাহা হউক, খুব শীঘ্র কিছু হইতেছে না; সুতরাং কাহারও গৃহ নির্মাণ কিংবা টাকা-জমানো বন্ধ করার কোন কারণ নাই; আর যিনি এই বইখানা পড়িতেছেন, তিনিও পড়িয়া যাইতে পারেন।

উপরে উক্ত দুইটী বিরুদ্ধমতের 'মধ্যবর্তী' আর একটা মতের সাক্ষাৎ পাই আমরা ভারতীয় দর্শনে। সেখানে জগতের চক্রবৎ পরিবর্তনের একটা কল্পনা রহিয়াছে। সৃষ্টি যাহা হওয়ার তাহা হয়; তারপর কিছুকাল উহার স্থিতি দেখা যায়; পরে আসে প্রলয় বা এই সৃষ্টির বিনাশ। কিন্তু এই বিনাশ চিরকালের জন্য নয়। প্রলয়ান্তে আবার সৃষ্টি হয়, পূর্বেরই মত সৃষ্টি। এ কল্পনায়ও যে খুব আনন্দ আছে, তাহা বোধ হয় নয়; কারণ, যতই সময় যাইতেছে ততই জগৎ প্রলয়ের দিকে ত অগ্রসর হইতেছে। ২০শ শতাব্দীতে লব্ধ মানুষের জ্ঞান-গরিমা ইত্যাদি সব ২১শ শতাব্দীতে টিকিবে কি না, ভাবিয়া কিছু হতাশ ত হইতে হয়।

অনেকে এই সমস্যায় মনকে প্রবোধ দেন এই বলিয়া যে, নিজের মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও কি মানুষ সংসার করে না, ঘর-দরজা মেরামত, ছেলেপিলের জামাকাপড় ইত্যাদি করে না? সকলেই ত সংসার ছাড়িয়া বনে গিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে না। তবে, কবে জগতের ধ্বংস হইবে এই ভাবিয়া আমাদের এত ভীত হইবার কি কথা হইল? জগতের প্রলয়ের কথাটা না ভাবিলে দোষ কি?

## ২২। ধর্ম, ঈশ্বর ও পরলোক

প্রাচীনদের একটা রীতি ছিল, কোন কাজের আরম্ভে এবং সমাপ্তিতে ঈশ্বরের নাম লওয়া; আরম্ভে উদ্দেশ্য ছিল, যাহাতে কোন বিঘ্ন উপস্থিত না হয়; সমাপ্তিতে নির্বিঘ্ন সমাপ্তির জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ছিল ইচ্ছা। আমরা আরম্ভে ঈশ্বরের কথা ভুলি নাই; অথচ সমাপ্তিতে আসিয়া পৌছিয়াছি; এখন একবার ঈশ্বরকে স্মরণ করা উচিত। তবে, যাহা বলিব তাহাতে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইবেন কিনা কে জানে? আগে ধর্মের কথাটা বলিয়া লই।

সভ্যতার আদিতে ধর্ম মানুষকে শাসন করিয়াছে, দর্শন ও বিজ্ঞানকেও শাসন করিয়াছে; এবং শাসন না মানার জন্য কঠোর সাজা—এমন কি প্রাণদণ্ড পর্যন্ত দিয়াছে। কিন্তু দিন বদলাইয়া গিয়াছে। এখন ধর্মই বিজ্ঞান ও দর্শনের বিচারাধীন হইয়া পড়িয়াছে। গ্রীক নাট্যকার আরিস্তফানিসের ( Aristophanes ) একটা নাটকে আছে, দুর্দান্ত ছেলে বুড়া বাপকে ধরিয়া ঠেঙ্গাইতেছে। বাপ, গুরুজন মারের যোগ্য নন, বলিয়া নিজের দোহাই নিজেই দিতেছেন। ছেলে উত্তর করিল, "বাবা, তোমার এটা দ্বিতীয় শৈশব; আমার শৈশবে তুমি যেমন আমাকে শাসন করিয়াছ এবং তোমার কথা মানিতে বাধ্য করাইয়াছ, তেমনই তোমার এই বর্তমান শৈশবে আমিই তোমাকে শাসন করিব এবং তোমাকে আমার কথামত চলিতে হইবে।" একদিকে দর্শন-বিজ্ঞান আর একদিকে ধর্ম, এই উভয়ের সম্পর্কের মধ্যেও তেমনই একটা উলট পালট ঘটিয়া গিয়াছে। ধর্মের বার্দ্ধক্যে বিজ্ঞান তাহাকে লইয়া বড় বেশী নাড়া-চাড়া আরম্ভ করিয়াছে। তাহার একটা বিশেষ ধারা দেখা দিয়াছে, আমেরিকার 'ধর্মের মনস্তাত্ত্বিকদের' মধ্যে। ধর্মানুভূতি, ধর্মবোধ এবং ধর্ম-বিশ্বাসও মনস্তত্ত্বের একটা ব্যাপার। সুতরাং মনের অন্যান্য ব্যাপারের সঙ্গে ধর্ম সম্বন্ধীয় সমস্ত অনুভূতি, বিশ্বাস ও ক্রিয়া মনোবিদ্যার আমলে আপনি আসে। এই মতটা গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনোবিদ্যার দিক দিয়া ধর্মানুভূতি ও ধর্মজ্ঞান ইত্যাদির বিশ্লেষণ আরম্ভ হইয়া গেল। *

প্রশ্ন উঠিল, ধর্মানুভূতি ও ধর্মের আচার প্রাকৃত জনের যৌন প্রবৃত্তিরই রূপান্তর নয় ত? অনেক প্রাচীন ধর্মে লিঙ্গ, যোনি

* দ্রষ্টব্য—William James—Varieties of Religious Experience; Leuba—Psychology of Religious Mysticism, ইত্যাদি গ্রন্থ।

ইত্যাদির অর্চনা বিহিত রহিয়াছে; ইহুদীদের ও মুসলমানদের ধর্মে 'সুন্নত' নামক ব্যাপার রহিয়াছে এবং ধর্মের অনেক পরিভাষা, অনেক অনুষ্ঠান ইত্যাদি যৌন প্রবৃত্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ভারতে সহজ দৃষ্টান্ত তন্ত্র; কিন্তু প্রাচীন মিশর আসিরিয়া, গ্রীস, রোম প্রভৃতিতেও মদ্যের এবং অন্যান্য 'ম'-কারের কম বেশী অর্চনা চলিত। আর, যৌন-প্রবৃত্তি যদিই বা ধর্মের মূল না হয়, তবে ভয় ত হইতে পারে। প্রকৃতিতে ভয়ঙ্করের ত অভাব নাই; বাত্যা, ভূমিকম্প, বন্যা—কত বস্তুই ত আমাদিগকে ভীতি-বিহ্বল করিয়া তুলে। এই সব আলোচনা করিয়া অনেকে শেষ পর্যন্ত ধর্মকে মানুষের সাধারণ যে সব নীচ প্রবৃত্তি আছে তাহারই কোন একটার একটু মোলায়েম, একটু সরস, একটু ভদ্র রূপ মাত্র মনে করিয়াছেন।

সকলেই এই মত গ্রহণ করিয়াছেন, এমন নয়। ধর্ম যে ধর্মই, ইহাই বরং এখনও অধিকাংশের মত। কিন্তু বিরুদ্ধ কথাটা যে উঠিয়াছে তাহার দিকে চক্ষু নিমীলিত করিয়া রাখা সাহসের অভাব বুঝাইবে। সুতরাং বিরুদ্ধ কথাটাও আমাদের জানা দরকার।

ধর্ম ত এইভাবে বৃদ্ধ বয়সে বিজ্ঞানের হাতে তাড়না ভোগ করিতেছে। ঈশ্বরের অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছে? ঈশ্বরের অস্তিত্ব লইয়া অনেক তর্ক পাশ্চাত্ত্য দর্শনে হইয়াছে। সাধারণত অস্তিত্বের যে প্রমাণ দেওয়া হয় তাহা সংক্ষেপে এই কয়টী; (১) ঈশ্বরের ধারণা আমাদের আছে, সুতরাং ঈশ্বর আছেন; (২) জগতের একটা কারণ ছিল—জগৎ কার্য, কারণ ছাড়া হয় নাই; সুতরাং উহার কারণ হিসাবে একজন প্রথম কারণ, যাহার অন্য কোন কারণ নাই, এরূপ একটা কারণ থাকা দরকার; অতএব জগৎ স্রষ্টা ঈশ্বর আছেন। (৩) জগতে বুদ্ধির ক্রিয়া দেখা যায়—উপায় দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধির চিহ্ন লক্ষিত হয় সুতরাং সমগ্র জগৎকে উপায় স্বরূপ ব্যবহার করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধি

করিতে পারেন এমন একজন ঈশ্বর আছেন। (৪) পাপ-পুণ্যের একজন বিচারক দরকার; ঈশ্বর ছাড়া সে আর কে হইবে? সুতরাং ঈশ্বর আছেন। (৫) মানবজাতির মধ্যে অনেক কাল হইতে ঈশ্বরে কোন না কোন প্রকারের বিশ্বাস সৃষ্ট হয়; বিশ্বাসের এই সর্বজনীনত্বও ঈশ্বরের অস্তিত্বের একটা প্রমাণ।

এ সমস্ত প্রমাণের কতকগুলি এ দেশের দর্শনেও বিবেচিত হইয়াছে। আবার, ঈশ্বর অসিদ্ধ, এমন কি, নাই, একথাও এ দেশের দার্শনিকদের কেহ কেহ বলিতে ভয় পান নাই। প্রতীচীতেও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। ঈশ্বরের অস্তিত্বের এই সকল প্রমাণ সকলের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করে নাই, ইহা স্পষ্ট।

ঈশ্বর সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্ন ইদানীং বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। (১) ঈশ্বর কি সত্যই খুব বুদ্ধিমান্? নির্ভুল সৃষ্টি করিতে পারেন? (২) এ জগৎটা কি খুব ভাল সৃষ্ট হইয়াছে? (৩) তিনি কি একাই সব পারিতেছেন? (৪) ঈশ্বর সৃষ্টির আদিতে না অন্তে?

ঈশ্বর নাই বলিলে এই প্রশ্নের একটীও উঠিবে না। তিনি আছেন (অথবা হইবেন) ধরিয়া লইয়া এই সব জিজ্ঞাসা সম্ভব। জিজ্ঞাসা যদি হয় তবে তাহার কি উত্তর? প্রথমত, ঈশ্বর খুব বুদ্ধিমান, এ বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। বুদ্ধির পরিচয় হয় কাজে। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে এত ভুল দেখান যায়, যে, উহার স্রষ্টাকে খুব চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান বলা কঠিন। সাহারার মরুভূমি ও মেরুপ্রদেশের জমাট বরফ একই পৃথিবীতে না করিলে চলিত না? তাপ ও শৈত্য আর একটু বিবেচনার সহিত বণ্টন করিলে আমাদের কত সুবিধা হইত? বেশী দৃষ্টান্ত লওয়া নিষ্প্রয়োজন। যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি রাশি রাশি দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতে পারিবেন। একটা সহজ কথা এই যে, সৃষ্টিতে অনেক দুঃখ-কষ্ট রহিয়াছে। সেগুলি

অসীম যাহার বুদ্ধি কল্পিত হয় তিনি ইচ্ছা করিলেই দূর করিতে পারিতেন। কাজেই দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত আসে, জগৎটা খুব ভাল হয় নাই। অনেকে অবশ্যই বলিয়াছেন যে, যাহা সম্ভব ছিল তাহার মধ্যে এইটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট জগৎ হইয়াছে। কিন্তু সর্বশক্তিমান যাঁহাকে বলা হয় তাঁহার বেলায় আবার সম্ভব-অসম্ভবের প্রশ্ন উঠিবে কেন?

আর একটা চাঞ্চল্যকর প্রশ্ন এই যে, ঈশ্বরের সৃষ্টিতে কি কেহ সহায় আছে, না, তিনিই একা স্রষ্টা? মানুষ ত অনেক কাজ করে; বন কাটিয়া সহর করে; পাহাড় উড়াইয়া দিয়া রাস্তা করে; জগতের অর্দ্ধেক সৌন্দর্যই ত মানুষের সৃষ্টি! গ্রীকদের সেই মূর্তিসকল, মিশরের সেই পিরামিড, ভারতের মন্দির ও তাজমহল;—পারিয়াছেন ঈশ্বর এমন সব সৃষ্টি করিতে? অবশ্যই তাজমহলের মজদুরেরা ছায়াপথ কিংবা সপ্তর্ষিমণ্ডল সৃষ্টি করিতে পারে নাই; তবু, তাহারাও ত স্রষ্টা! ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে, কাব্যে, সঙ্গীতে, ইতিহাসের ঘটনায় মানুষ কি স্রষ্টা নয়? বন্য পশু ও পাখীদিগকে নির্বংশ করিয়া পালিত পশুপক্ষীর আদর করিয়া—বন্য বৃক্ষের উৎপাদন করিয়া, উদ্যান নির্মাণ করিয়া—মানুষ কি জীবনহীন ও জীবনবান্ জড়ে সমানভাবে নিজের সৃষ্টি ক্রিয়ার বিকাশ দেখাইতেছে না? নিজের প্রাচীন রাষ্ট্র ও সমাজ ভাঙ্গিয়া মানুষ কি নূতনের সৃষ্টি করিতেছে না? কি সিদ্ধান্ত করিব? জগৎ অনেকের সমবেত চেষ্টার সৃষ্টি; তবে, এই স্রষ্টাবৃন্দের মধ্যে ঈশ্বরই প্রথম ও প্রধান। এইরূপ একটা কথাও পাশ্চাত্ত্যে অনেক বলিয়াছেন।

সাধারণ লোকে ভাবে, ঈশ্বর অসীম, অনন্ত শক্তিমান, সনাতন এবং সর্বত্র বিদ্যমান। কেহ কেহ * ভাবিতে সাহস পাইয়াছেন,

* দ্রষ্টব্য—H. G. wells—"God the Invisible King", এবং এই জাতীয় গ্রন্থ।

যে ঈশ্বর অসীম ঠিক নন; তিনি সসীম; বুদ্ধি ও শক্তি খুব বেশী, তবে অন্তহীন নয়; তিনি চির-যুবক; মানব জাতির দলপতি বা সেনাপতি; তাহাদের নেতা; এবং তাহাদের সঙ্গে এক যোগে সৃষ্টির কাজ করিয়া যাইতেছেন। জগৎ ক্রমশ উন্নততর হইতেছে; মানব জাতির রাষ্ট্র ও সমাজের উন্নতি হইতেছে; এবং সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরও উন্নততর হইতেছেন; বড় হইতেছেন, অধিকতর শক্তি ও বুদ্ধি অর্জন করিতেছেন। শিশু বড় হয়, যুবকও দেহে মনে বৃদ্ধি পায়; ঈশ্বরও তাহাই পাইতেছেন।

ইহা অপেক্ষাও একটা গুরুতর প্রশ্ন উঠিয়াছে। ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, না, জগৎ ঈশ্বর সৃষ্টি করিবে! ঈশ্বর সৃষ্টির আদিতে না অন্তে? একথাও কেহ কেহ সাহস করিয়া বলিয়া ফেলিয়াছেন, যে, ঈশ্বর এখনও আবির্ভূত হন নাই; তবে, জগতের গতি ঈশ্বরত্বের আবির্ভাবের দিকেই চলিয়াছে।* ইহার অর্থ এই দাঁড়াইবে যে, প্রাচীনরা যে বলিতেন 'সদেব সোম্য ইদং অগ্রে আসীৎ'—আদিতে ঈশ্বর ছিলেন, ইত্যাদি, তাহা গ্রহণীয় সিদ্ধান্ত নয়। আদিতে জগৎ ছিল—জগৎ এখনও বিকশিত হইতেছে; এই বিকাশের অন্তে ঈশ্বর আবির্ভূত হইবেন। ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন নাই; ইহা অ-সৃষ্ট; কিন্তু জগৎ ঈশ্বর সৃষ্টি করিবে। জগতের সমস্ত ক্রিয়া ঈশ্বর-সৃষ্টির দিকে অগ্রসর হইতেছে; ইহাই জগতের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। ঈশ্বর জগতের কর্তা বা কারণ নন, জগতের অন্তিম লক্ষ্য!

এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে আগের তিনটী প্রশ্ন অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। ঈশ্বর যদি এখনও জন্মিয়া না থাকেন, তবে, তাঁহার বুদ্ধির

* দ্রষ্টব্য—পূর্বে উদ্ধৃত আলেকজাণ্ডারের মত; আর, H. G. Wells—"God the Invisible King,' ইত্যাদি গ্রন্থ।

প্রশ্ন অবান্তর; আর সৃষ্টি যদি তাঁহার না হয়, তবে ইহার দোষ গুণের বিচারেও তাঁহার নাম উঠা উচিত নয়; এবং সৃষ্টি-ক্রিয়ায় কাহারও সাহায্য তিনি লইতেছেন বা লইয়াছেন কিনা, সে প্রশ্নও উঠে না।

ধর্ম ও ঈশ্বরের আলোচনার সঙ্গে আরও একটা প্রশ্ন উঠে; সেটী পরলোকের প্রশ্ন। আত্মা দৈহিক মরণের সঙ্গেই মরে না, এটী মানব সমাজে অতি ব্যাপক বিশ্বাস। ভারতীয় দার্শনিকদের মতে এই আত্মা মৃত্যুর পর দেহ হইতে দেহান্তরে—এমন কি মানুষের দেহ হইতে জীব দেহে কিংবা উদ্ভিদের দেহেও যাইতে পারে। ইহার নাম 'সংসার'। ইহাই আত্মার দুঃখ। দার্শনিক জ্ঞান লাভ হইলে এই দুঃখ হইতে আত্মা মুক্ত হয়। এই মুক্ত অবস্থার নানারূপ বর্ণনা আছে; সে সব এখানে অবান্তর। ইহারই নাম পরলোক। সাধারণ মানুষের কল্পনায় এই পরলোকের দুইটী ভাগ আছে—স্বর্গ ও নরক; কেহ কেহ এই উভয়ের মধ্যবর্তী একটা স্থানও কল্পনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য চিন্তায়ও এই সব কম বেশী দেখা যায়। তবে, দেহান্তর প্রাপ্তির বিশ্বাস সেখানে খুব অল্প লোকেই গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু আত্মা যে অমর এবং তাহার যে এই জীবনের পরও আর একটা অনন্ত জীবন আছে, সে কথা অনেককাল সর্বদেশের মানুষই কোন না কোন আকারে বলিয়াছে। আত্মা যে অমর—'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'—তাহার নানাবিধ প্রমাণও দেওয়া হইয়াছে। একটা বড় প্রমাণ পাপ-পুণ্যের বিচার। পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার হইবেই, ইহা মানুষ ভাবে। অথচ, দেখা যায়, এ জীবনে সব সময় সকলের সকল পাপ-পুণ্যের শাস্তি-পুরস্কার হইয়া যায় না; সুতরাং এই শাস্তি-পুরস্কার যাহাতে ঘটিতে পারে, সেইজন্য আত্মার আর একটা জীবন স্বীকার করিতে হয়। আর, ইহাও দেখা যায় যে, মানুষের মনের শক্তি

বার্দ্ধক্যের দিকেই বাড়িয়া চলে। মৃত্যুই যদি সবের শেষ হয়, তবে এই মানসিক উন্নতি ত একটা বিরাট নৈসর্গিক অপচয়। কারণ, এই সব অর্জিত শক্তি ত জগতের কোন কাজেই—আত্মার নিজেরও কোন কাজেই লাগিল না। কাজেই ধরিয়া লইতে হয়, পরলোকে আত্মার এই সব শক্তি আরও বিকশিত হইবে এবং তাঁহারই উন্নতিতে প্রযুক্ত হইবে। পরলোকের অস্তিত্বের ইহাও একটা প্রমাণ। আরও প্রমাণ আছে। সমস্ত প্রমাণের আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু এ সব প্রমাণ কি বাস্তবিকই প্রমাণ? ইহাদের বিরুদ্ধে কি কিছু বলা যায় না? পাপের শাস্তি আর পুণ্যের পুরস্কার হইবেই; ইহা বিশ্বাস হইতে পারে, কিন্তু প্রমাণিত সত্য কি? আর, নিসর্গে অপচয়ের দৃষ্টান্ত এত রহিয়াছে যে মানুষের কতকটা জ্ঞান বা বুদ্ধি কোন কাজে লাগিল না, দেখিয়াই কল্পনা করা চলে না যে আর একটা লোক আছে যেখানে উহা কাজে লাগিবে। কাজেই শেষ পর্যন্ত অনেকে এই সিদ্ধান্ত করিতে চাহিয়াছেন যে, আত্মার অমরত্ব, তাহার অনন্ত জীবন কল্পনা করা বা বিশ্বাস করা যত সহজ, প্রমাণ করা তত সহজ নয়।

ইহা অপেক্ষা বরং দৈহিক অমরত্ব প্রমাণ করা সহজ। কথাটা আমরা পূর্বেও বলিয়াছি। জীব-জগতে এবং উদ্ভিদের জগতে দেখা যায়, দেহ হইতে দেহান্তরের উৎপত্তি হয়। ভূমিতে একটী বাঁশ পুঁতিলে তাহার শিকড় হইতে অসংখ্য বাঁশের উৎপত্তি হয়। বাঁশের এই বংশ বৃদ্ধিতেও একটা অমরত্ব দেখা যায়। জীবের বেলায়ও এক দেহের যে বীজ-কোষ হইতে দেহান্তরের সৃষ্টি হয়, তাহা ধ্বংস পায় না; কোনও এক রহস্যজনক ভাবে জনন-কারী এই বীজ-কোষ দেহ হইতে দেহান্তরের সৃষ্টি করিয়া আবার এই দ্বিতীয় দেহ হইতে

তৃতীয় দেহেতে এবং সেখান হইতে চতুর্থ দেহেতে যায়;—এই ভাবে উহা ক্রমান্বয়ে দেহের পর দেহের সৃষ্টি করিয়া দেহ হইতে দেহান্তরে ভ্রমণ করে, অথচ তাহার মৃত্যু নাই এবং সৃষ্টিতে তাহার লয়ও নাই; ইহা জীব-বিস্তার একটা মত। তাহা যদি সত্য হয়, তবে, উহাও একটা দৈহিক অমরত্বের প্রমাণ। কিন্তু বাঁশটী কাটিয়া ঘরের খুঁটি করিলে কিংবা আগুনের ইন্ধন করিলে তাহাতে অবস্থিত আত্মা আর একটা বাঁশে কিংবা জীবদেহে গিয়া আশ্রয় লইবে কিংবা অন্য এক লোকে গিয়া আর এক প্রকার জীবন লাভ করিবে, ইহা কষ্ট-কল্পনা। মানুষের বেলায়ও ইহা সহজগম্য সত্য নয়।

প্রেত-তাত্ত্বিকেরা প্রেত-আত্মাকে ডাকিয়া আনিয়া যে তাহার মৃত্যুর পর অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চাহেন, তাহারও বিরুদ্ধ মত সম্ভব। প্রেত-আত্মা তাহার নূতন জীবনের এবং নূতন লোকের সংবাদ খুব বেশী দেয় না; 'ভাল আছি', 'সুখে আছি', 'আসিতে কষ্ট হয়' প্রভৃতি ধরণের কথা ছাড়া প্রেতাত্মার কাছে আর সংবাদ বড় বেশী পাওয়া যায় না। অথচ, সে যে অমুকের আত্মা তাহা বুঝাইবার জন্য সেই ব্যক্তির অতীত জীবনের ঘটনা কিছু কিছু বর্ণনা করে। এই প্রকার বৃত্তান্ত যে জানে এইরূপ লোকের সুপ্ত স্মৃতির পুনরুন্মেষও ত হইতে পারে। এই সব আলোচনা হইতে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত কিছু করা সম্ভব নয়, এই পর্যন্ত বলিলে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী উভয়েরই মন রক্ষা হইবে, আশা করি। উত্তর যাহাই হউক, আত্মা অমর কি না, এই প্রশ্নটী এখনও জীবন-বান্, ইহা উল্লেখ করা আমাদের উচিত। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা উচিত যে, অনন্ত জীবন—যে জীবনে কখনও দাঁড়ি পড়িবে না, এরূপ জীবন—সত্য সত্যই কাম্য বস্তু কি না, তাহাও জিজ্ঞাসা করা চলে। কার্যের পর বিশ্রাম আমরা চাই; তেমনই জীবনের শেষে জীবনের বিরতি ভাবিতে

কি সত্যই চিত্ত অবসন্ন হইয়া আসে? অনেকে মনে করেন, এই বিরতি ত বরং আনন্দেরই হওয়া উচিত!

এই সকল ছেলেদের বিতর্ক-সভার প্রশ্ন নয়; গুরুগম্ভীরভাবে দর্শনে উঠিয়াছে। পক্ষে-বিপক্ষে যে সব যুক্তি দেওয়া যায়, সেই সব চিন্তায়ই দার্শনিকের আনন্দ। কিন্তু এইখানে একটা কথা আমাদিগকে বার বার বলিতে ইচ্ছা করিতেছে—সেটী পাশ্চাত্ত্যের সাহস। প্রাচীন ভারতেও অনুরূপ সাহস দেখিতে পাই; জৈন ও বৌদ্ধেরাও ঈশ্বর অস্বীকার করিয়াছে। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্ত্যে একটা প্রবল ধর্ম বর্তমান—তাহার গোষ্ঠী আছে, শাসনশক্তি আছে, এবং এক সময়ে সে দর্শন-বিজ্ঞানকে শাসনও করিয়াছে। সেই ধর্মের অবস্থিতি কালে এতটা সাহস কম কথা নয়! আমাদের দেশে বর্তমানে এতটা সাহস সকলে বরদাস্ত করিবে কি না, সন্দেহ। মুহম্মদের ছবি ছাপিয়া একটা লোক প্রাণ হারাইয়াছে, সে খুব বেশী দিনের কথা নয়; অথচ, উহা ধর্মের বিরুদ্ধ সমালোচনা কিছু নয়, না জানিয়া ঐ ধর্মের একটী বিধান লঙ্ঘন করা মাত্র। আর, কোন ধর্মের বিরুদ্ধ কথা বলিয়া প্রাণদানের দৃষ্টান্ত মোটেই বিরল নয়। কিন্তু ইউরোপে যীশু সম্বন্ধে এত নিরঙ্কুশ চিন্তা চলিয়াছে যাহা ভাবিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। * প্রচলিত ধর্মের পক্ষের কথা বলা—তাহার মহত্ত্বের প্রশংসা করা সহজ; কিন্তু তাহার বিরুদ্ধ কথা বলা—সাহিত্য বা বিজ্ঞানের বিচারের মত তাহার বিচার করা, তত সহজ নয়। অথচ যীশুর ধর্মসম্বন্ধে এমন কথা বলা হইয়াছে যাহা শুনিলে ধর্মভীরু অনেকেই ভীত ও সন্ত্রস্ত হইবেন। খ্রীষ্টের ধর্মের ধ্বংস না হইলে সভ্যতা আর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, এমন

* Strauss ও Renan প্রণীত 'যীশুর জীবনী' দুইটী দ্রষ্টব্য। এই বই দুইখানা যথাক্রমে ১৮৩৫ ও ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

কথাও বলা হইয়াছে। * খ্রীষ্ট ধর্ম মিথ্যা, ঈশ্বরের পূজা আর পুতুল পূজা এক; প্রার্থনার কোন সার্থকতা নাই; আত্মা অমর নয়; স্বর্গ-নরক, পুরস্কার ও শাস্তি সত্যসত্যই নাই। এমন ধরণের কথাও ইউরো-আমেরিকা আজ শুনিতেছে। খ্রীষ্টের ধর্মের বিলোপ যাহারা আকাঙ্ক্ষা করে তাহারা সকল ধর্মেরই বিলোপ চায়; কারণ, অন্য সকল ধর্ম হইতে খ্রীষ্টের ধর্ম শ্রেষ্ঠ, ইহা ধরিয়া লইয়া যখন ইহাকেও মানবের অগ্রগতির বাধা মনে করা হয়, তখন অন্য সব ধর্মের সম্বন্ধে পৃথক্ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। প্রাচীন সমস্ত ধর্মেই উপাসনা, উপবাস, তীর্থযাত্রা প্রভৃতির উপদেশ রহিয়াছে, স্বর্গ, নরক ও অমর আত্মায় বিশ্বাস রহিয়াছে। আজিকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই করিলে এই সমস্তেরই প্রাচীন মূল্য টিকিবে কি? এই ধরণের ভাব ও ভাষা গ্রহণ না করিতে পারা যায়, কিন্তু ইহাতে যে সাহস প্রকাশ পাইয়াছে তাহা কি বিস্ময়জনক নয়? সে সাহসকে কি কোন সম্মান দেখান যায় না? শ্রদ্ধা করা চলে না?

প্রশ্নগুলি বুঝিলাম; এখন আমাদের কি সিদ্ধান্ত? আমরা একটু সাবেক-পন্থী: এবং জীবনের সায়াহ্নে উপনীত; সুতরাং ঈশ্বরের জাতকর্মের জন্য অপেক্ষা আমরা করিতে পারি না। ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়া জগৎ হইতে সরিয়া পড়িয়াছেন, ইহাও ভাবিতে পারি না; আর, সৃষ্টি নাট্যের শেষ অঙ্কে তিনি আবির্ভূত হইবেন, ইহাও অকল্পনীয় মনে হয়। অনেকে ভাবিতেন ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াই সরিয়া পড়িয়াছেন, জগৎ তারপর আপনিই চলিতেছে। তবে, বিশেষ প্রয়োজনে তিনি কখনও আবার আসিয়া উহাকে ঠিক করিয়া দিয়া যান—ঘড়ি-ওয়ালা যেমন

* (1) The Martyrdom of man ( Winwood Reade) শেষ অধ্যায়। (2) The Genealogy of morals ( Nietscde ), ইত্যাদি গ্রন্থ।

ঘড়ি ঠিক করে, তেমনই। তিনি জগতে উপস্থিত নাই। আমরা এরূপ ভাবিতে পারি না। জগতে দুঃখ কষ্ট আছে, ঠিক; তবে, উহা শষ পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টি ভঙ্গি অথবা বুঝিবার ভুলও হইতে পারে। আর, দুঃখ কষ্ট বর্তমান রহিয়াছে বলিয়াই স্রষ্টা সৃষ্টিতে উপস্থিত নাই, এরূপ সিদ্ধান্তই বা হইবে কেন? তাঁহাকে নির্দয় বলিতে হইবে, এমনও কোন যুক্তি নাই।

সৃষ্টির বাহিরে যেমন স্রষ্টাকে ভাবিতে পারি না, তেমনই স্রষ্টা কখনও সৃষ্টি ছাড়া ছিলেন তাহাও ভাবি না। জগতের ভাঙ্গাগড়া সনাতন প্রবাহ। যে জগৎ দেখিতেছি ইহাই প্রথম ও শেষ সৃষ্টি না-ও হইতে পারে। কিন্তু সক্রিয় শক্তি কখনও নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বরের সৃষ্টি তাঁহারই মত অনাদি ও অনন্ত।

আর, ঈশ্বর এখনও দেখা দেন নাই, ইহাও ভাবি না। সুতরাং আমাদের মতে "আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে"; অর্থাৎ মহাভারতের যেমন সর্বত্রই হরির কথা রহিয়াছে—আদিতে, অন্তে এবং মধ্যে—সৃষ্টিতেও তেমনই ঈশ্বর সর্বত্র রহিয়াছেন—তবে, সৃষ্টির আদিও নাই, অন্তও নাই; সুতরাং ঈশ্বর সর্বত্র ও সর্বকালে রহিয়াছেন; ইহাই আমাদের শেষ কথা। আর, আমাদের যাহা শেষ কথা, তাহাই পাশ্চাত্ত্য দর্শনে এখন পর্যন্ত অধিকাংশের মত; বিরুদ্ধ মত সকল বলবান্ হইলেও সর্ববিজয়ী নয়; তাহাদিগকে বাদ দিলে আমাদের যাহা সিদ্ধান্ত, তাহাই এখন পর্যন্ত গৃহীত সিদ্ধান্ত।

## ২৩। উপসংহার

গত চার শ' বছরের পাশ্চাত্ত্য দর্শনের এই বিবরণ হইতে উহার সম্বন্ধে আমাদের কি ধারণা হওয়া উচিত? ইহার দুরন্ত সাহস

আমাদের প্রথমেই চোখে ঠেকিবে। কিছু ভাবিতেই এই দর্শন ভয় পায় না। ঈশ্বর ও ধর্মকে সাধারণ লোকে সকলের চেয়ে বেশী ভয় পায়—রাজার চেয়েও এমন কি গোয়েন্দা পুলিশের চেয়েও। অথচ এই ঈশ্বর ও ধর্ম সম্বন্ধে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দর্শন কি ভয়ে কথা কয়? ভয় নাই বলিয়াই ইহা অত্যন্ত স্বাধীন। কোন ব্যক্তি বা কোন শাস্ত্রের বাণী ইহাকে পথ দেখাইয়া দেয় না। সকলের কথাই সে শুনে; কিন্তু বিচার না করিয়া গ্রহণ করে না কিছুই। ভারতের বেদান্ত উপনিষদের বাক্যের সীমা লঙ্ঘন করে নাই; বুদ্ধ যদিও অত্যন্ত স্বাধীন ছিলেন, তথাপি বৌদ্ধেরা বুদ্ধের বাণীকে শাস্ত্র বলিয়া মানিত—বেদান্ত যেমন উপনিষদ মানিত, তেমনই। কিন্তু আজকার পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সম্বন্ধে এরূপ কথা বলা চলে না। ইহা কোন শাস্ত্রের অধীন নয়; এমন কি, আণবিক বোমার আবিষ্কর্তা বিজ্ঞানেরও নয়।

দ্বিতীয়ত, আমাদের চোখে ঠেকিবে এই দর্শনের বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা। ইহা মানুষের সমগ্র জীবন ও জগতের সমগ্র সত্য ভাবে এবং বিচার করে; শুধু ওপারের কথা নয়। মানুষের গৃহ, সমাজ, রাষ্ট্র, মানুষের ইতিহাস, সভ্যতা ও ভবিষ্যৎ—কিছুই এই দর্শন আলোচনার অযোগ্য মনে করে না।

তৃতীয়ত, ঐহিকের প্রতি অনাদরের অভাব ইহার আর একটী বৈশিষ্ট্য। বৃহত্তর জগৎ ও মহত্তর সমাজ সৃষ্টি করিয়া মানুষের জীবনকে অধিকতর সুখময় করা, দার্শনিক চিন্তার অযোগ্য মনে করা হয় নাই। সত্য জানিতে চাই; মঙ্গল লাভ করিতে চাই; এবং সুন্দর সৃষ্টি করিতে চাই; মানবের এই ত্রিবিধ আকাঙ্ক্ষা আজ পরিস্ফুট রূপ লাভ করিতেছে পাশ্চাত্ত্যের চিন্তায়। সত্য, শিব ও সুন্দর—এই প্রাচীন উক্তি পাশ্চাত্ত্য দর্শনে অপ্রয়োজ্য নহে। 'এই দর্শন

জড়বাদে, অবিশ্বাসে ও অধর্মে ভর্তি, একথা যাঁহারা বলেন তাঁহারা ইহার সঙ্গে একেবারে অপরিচিত অথবা অতি অল্পপরিচিত।

চিন্তাশীলের চিন্তা পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারে; এরূপ উপাদান ইহার চারিদিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে। কোন একখানা গ্রন্থের কিংবা কোন একজনের দর্শনের সহিত পরিচয় লাভ করিলেই সকলের সকল জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ হইবে না, ইহা হয়ত ঠিক; কিন্তু একটু বিস্তৃতভাবে এই দর্শনের প্রাঙ্গনে বিচরণ করিলে কাহারও কোন জিজ্ঞাসা অতৃপ্ত থাকিয়া যাইবে বলিয়াও ত মনে হয় না। প্রতীচীর—ইউরো-আমেরিকার শ্বেতজাতি সমূহের রাজনীতি, তাহাদের রাজ্যলাভ ইত্যাদির বিরুদ্ধে আমাদের অনেক কিছু অভিযোগ আছে, সত্য; কিন্তু তাহাদের দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্য, তাহাদের আবিষ্কার, নির্মাণ ও শিল্প কাহারও অগ্রহণীয় নয়। একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, যে, তাহাদের এক শ্রেণীর লোক যখন পৃথিবীতে রক্তের বন্যা বহাইয়া দেয়, তখনও সে সব দেশেও জগতের হিত চিন্তা করিতে পারেন, এমন দার্শনিক নিভৃতে বসিয়া দর্শন ভাবেন। নেপোলিয়নের সময়ে রক্তগঙ্গায় ইউরোপ ভাসিয়া যাইতেছিল; কিন্তু তখনও কাণ্ট, হেগেলের মত দার্শনিক জার্মেণীতে ছিলেন; আর ক্রীতদাস প্রথা তুলিয়া দেওয়ার জন্য ইংলণ্ডের কোন কোন মনীষী আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিলেন। রাষ্ট্রের কলহ দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্যের মূল্য নিরূপণে সহায়ক নয়; এ সকলের মূল্য নিরূপণে সে কলহের কথা উঠাই উচিত নয়। পরাজিত গ্রীসের দর্শন রোম মাথায় করিয়া লইয়াছিল; পরাধীন ইহুদী জাতির সন্তান যীশুর ধর্ম ইউরোপ গ্রহণ করিয়াছে; বিজেতা রোমের আইন ও শাসন-রীতি বিজিত ইউরোপ স্বীকার করিতে সংকোচ বোধ করে নাই; বিজেতা ও প্রভাববান্ ইউরোপের অস্ত্রবিজ্ঞান এশিয়ার লোকে মানিয়া

লইয়াছে; তাহার সাধারণ বিজ্ঞানও অমান্য করার উপায় নাই। সুতরাং তাহার সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হওয়াও কোন দোষ নয়। কোনও জাতির অধীনতার শৃঙ্খল ইহাতে বরং শিথিলই হইবে, দৃঢ়তর হইবে না। ভারতের জাতীয়তা, তাহার স্বাদেশিকতা ও স্বাজাত্যবোধে মিল্, স্পেনসরের মত দার্শনিক কি কোন সহায়তাই করেন নাই? ফরাসী বিপ্লবের সময়ের সাহিত্য ও দর্শন এবং আধুনিক রুশ বিপ্লবের প্রেরণা এদেশকে কি কিছুই দেয় নাই?

কাজেই পাশ্চাত্ত্য দর্শন ভারতীয় দর্শনের মত মোক্ষশাস্ত্র ঠিক না হইলেও অশ্রদ্ধার বস্তু নয়। পশ্চিম হইতে অনেক কিছু আমরা গ্রহণ করিয়াছি; তাহার পাপ ও অসদাচরণও কিছু কিছু লইয়াছি। কুকুর-পোষা ও পোষাক তাহারই অণুকরণে আমাদেরও হয়। আর, নানাবিধ আবিষ্কারের উৎস তাহার বিজ্ঞান না মানিয়া পারি না। তাহার সাহিত্যও নগণ্য নয়। সুতরাং তাহার দর্শনকেও আমাদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখা উচিত। আধ্যাত্মিক চিন্তায় এবং দর্শনে আমরা প্রতীচী হইতে শ্রেষ্ঠ কিনা, এই প্রশ্নের মীমাংসা না করিয়াও প্রতীচীর দর্শনকে শ্রদ্ধা করা চলে, এবং তাহা করাই উচিত। নিজস্ব স্বাধীন চিন্তা বিসর্জন না দিয়াও পরের চিন্তার প্রতি শ্রদ্ধা দেখান যাইতে পারে; এবং তাহাই করা উচিত।

# ভ্রম-সংশোধন

[স্মর্তব্য: যে সব ভুল অর্থের অসঙ্গতি অথবা অর্থবোধে অসুবিধা ঘটাইতে পারে, সেগুলিই কেবল শুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। তালিকা অনাবশ্যকরূপে দীর্ঘ হইয়া যাইবে ভয়ে সামান্য বানান ভুল ইত্যাদি এখানে ধরা হয় নাই।

| পৃষ্ঠা | পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ।১/০ | ৩ | কি টা | কিছুটা |
| ১৯ | ২৩ | ভরিত | ভরতি |
| ২৪ | ২১ | কি কাণ | কিন্তু কাণ |
| ৩৭ | ১৫ | | (দ্বিতীয় বাক্যটির আরম্ভে) 'ভিন্ন ভিন্ন জীব তাহার চেতনত্বের' এই কয়টি কথা বসিবে। |
| ৩৫ | ৫ | আমেরিকাও | আমেরিকারও কতক অংশ |
| ৩৬ | ১৫ | মধ্য | মধ্যে |
| ৪২ | ১২ | বাহিরিন্দ্রিয়ে | বহিরিন্দ্রিয়ের |
| ৪৭ | ১৮ | কর্সিকার | কর্সিকার এক |
| ৭৬ | ১৮ | আরম্ভে | but বসিবে |
| ৭৯ | ১৫ | এ-কার্যে | একার্থে |
| ৯৩ | ২৪ | পড়িবে রাসেই | পড়িবার সেই |
| ১১৩ | ২ | বস্তু-জগতের | বস্তু-জাতের |
| ১৩০ | ৫ | প্রকৃত | প্রাকৃত |
| ১৩৪ | ১৫ | করিকায় | করিবার |
| ১৩৭ | ১১ | অভীপ্সিত | অনীপ্সিত |
| ১৪৮ | ১১ | ঐখানে | ঐশানে |
| ১৫৮ | ১৫ | উৎপাদন | উৎসাদন |
| ১৬৫ | ৩ | শষ | শেষ |
| ১৬৭ | ১০ | রাজ্য-লাভ | রাজ্যলোভ |